Vol. 39 | No. 3 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কমলাকান্ত : বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসংকট ও উনিশ শতক

Volume	39
Issue	3
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v39i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v39i3.5
Pages	151-178
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কমলাকান্ত : বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসং[illegible] ও [illegible]ক

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

'বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি' ও 'সমাজসেবা' মুখ্যত দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪)' 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রিকা ১২৭৯ সনের ১লা বৈশাখ থেকে সম্পাদনা শুরু করেন। এই 'বঙ্গদর্শনেই' ১২৮০-৮২ সনের মধ্যে কমলাকান্তের 'সমুদয় রচনা' প্রকাশিত হয়। এই সমুদয় রচনা থেকে 'একুনে এগারটি' নিয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ১৮৭৫ সালে প্রথম প্রকাশের সংবাদ জানা যায়। অতঃপর 'কমলাকান্তের দপ্তর'[ক] 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'-শীর্ষক তিনটি অংশ প্রথম পরিবর্ধিত সংস্করণরূপে ১৮৮৫ সালে মুদ্রিত হয়, যেখানে একটি ভূমিকাসহ কুড়িটি 'সন্দর্ভ' সংযোজিত হয়েছে। তবে, এর মধ্যে, দুটি প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক লিখিত নয়।[১]

'প্রকৃষ্টরূপে নিবন্ধনকৃত গদ্যের আঙ্গিকে রচিত সন্দর্ভ' বলতে অধুনা যে ধরনের 'গবেষণাধর্মী' বা 'প্রথা আশ্রিত' রচনারীতিকে সাধারণত ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, অবশ্য কমলাকান্তের রচনারীতি তা নয়। তাই কোন সমালোচক উপন্যাস হিসেবে অভিধা প্রদানে সচেষ্ট। এ ছাড়াও, কমলাকান্তের বিষয়বস্তুকে কোন কোন সমালোচক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আশা-ভঙ্গের ও জীবন সংকটের গীতিকাব্য হিসেবে অথবা সংবেদনশীল কবিমন সৃষ্ট ''গদ্য-শিল্প' হিসেবে শ্রেণী বিন্যাসে প্রয়াসী।[২] তবে, এসব মন্তব্য কমলাকান্তের বিষয়বস্তু ও রচনারীতি সম্পর্কে আপেক্ষিক বিশ্লেষণজাত ত্রসরেণু। মূলত কমলাকান্ত মিশ্ররীতির রচনা। আত্ম ও সমাজ সমালোচনামূলক হাস্যরসপ্রধান ব্যক্তিগত নিবন্ধ বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি হবে না।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন 'অসামঞ্জস্যমূলক কর্ম ও চিন্তাধারার উৎসগুলোকেই' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখায় নানাভাবে প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছেন। এই অসামঞ্জস্যমূলক উৎসই তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধে হাস্যরস সৃষ্টির মূলাধার এবং চারিত্র্য-বিশ্লেষণে এই হাস্যরস স্মিতহাস্যরস। এই হাস্যরসের লক্ষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য রয়েছে, ''মুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী, অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।'' এই হাস্যরসের উপজীব্য হিসেবে নানা চরিত্র ও ঘটনার যে উৎস বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োগ করেন, তা নিতান্ত সমকালচ্যুত নয় এবং এইসব ঘটনা ও চরিত্রের অধিকাংশই হিন্দু সমাজ আশ্রিত। তিনি ব্যঙ্গ বা হাস্যরস সৃষ্টির মূলাধার

হিসেবে মুসলমান সমাজের বৃহত্তর কোন ত্রুটি বা দুর্বলতাকে গ্রহণ করেননি। এক্ষেত্রে তাঁর সমাজ সচেতনতা স্বীয় সমাজ আশ্রয়ে আবর্তিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'লোক রহস্য' (১৮৭৪)-প্রবন্ধ গ্রন্থে যে হাস্যরস ধারা প্রবহমান, তাই আরো শৈল্পিক ও পরিণত মাত্রায় কমলাকান্তে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে শিল্প-সম্ভাবনার যে সার্থক ও প্রসারিত রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তা অনিবার্য এবং বিশেষ সঙ্গতভাবেই হাস্যরসধারায় এক স্বতন্ত্র ও মৌলিক ভুবন নির্মাণে সক্ষম ও প্রযত্ন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' শীর্ষক এই রচনায় যে বিশুদ্ধ নির্মল হাস্যরসসহ বিদ্রুপ ও ব্যঙ্গের তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশের সমন্বয় লক্ষণীয় তা প্রধানত: দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) ও মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ব্যতীত অন্যান্য সাহিত্য স্রষ্টার লেখনীতে প্রায়শ দুর্লভ। এই দুর্লভ গুণই এক অসাধারণের মর্যাদা দিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর কমলাকান্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মূলত 'বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র ব্যক্তি পুরুষটি কমলাকান্তের মধ্যদিয়ে আমাদের সম্মুখে যেভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন, তেমনটি অন্য কোথাও নেই। গদ্য লেখার ভেতর দিয়ে লেখকের সঙ্গে এমনতর গভীর পরিচয় বাংলা সাহিত্যে বিরল।' উল্লেখ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁর এই শিল্প সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমৃত্যু নি:সন্দেহ ছিলেন।[৪]

কমলাকান্তের শুরু এভাবে 'অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত।' লেখক প্রথমেই এমন একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, অতঃপর যা বলা হবে তা স্থির বুদ্ধি সম্পন্ন কোন চরিত্রের প্রাজ্ঞ-বাক্যাবলী নয়। পাগলের অহেতুক প্রলাপের মতোই তা বিবেচ্য হলেও ক্ষতিবৃদ্ধির হেতু নেই। ভূমিকা বর্ণনাকারী ভীষ্মদেব খোশনবীসের ভাষায় আরো বর্ণনা রয়েছে, তা হলো, ''আমি তাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম।'' বঙ্কিমচন্দ্রের সযত্ন পরিশীলিত ভাষা বিন্যাসে প্রথমেই মাত্র তিনটি অনুচ্ছেদের মধ্যে 'পাগল' শব্দটির ইতিমধ্যে দু'বার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখে মনে হয়, তিনি এখানে এমন একজনের চরিত্র পরিস্ফুটনে আগ্রহী, যাকে পাঠক নিজের মনের মতো করে যথা ইচ্ছে গ্রহণে সচেষ্ট হবে। যাকে সামাজিক জীবনবোধের নৈমিত্তিক যোগ-বিয়োগের সরল জিজ্ঞাসায় অভ্যস্ত মানুষ সহজেই গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত হবে না। অবলীলা ও অবহেলায় যা বোধের এক অতলান্ত গভীরে পাঠককে ক্রমশ পৌঁছে দেবে। অতএব, কমলাকান্তের ভূমিকায় উদ্ধৃত খোশনবীসের বাক্যাবলী বলা চলে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের এক সর্তক কৃত্রিম আচরণ এবং ছল বা ভান স্বরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সচেতন ভাবেই এই সমস্ত বাক্য দ্বারা এমন এক চিত্রকল্পতুল্য স্বপ্নের মায়াময় ভুবন সৃষ্টিতে পারঙ্গম, যেখানে এই বাস্তবের প্রপঞ্চ প্রতারিত ছদ্মবেশী জীবনচর্চায় পাগল আপাতঃ অর্থে আপেক্ষিক চরিত্রের অধিকারী, পাগলই প্রকৃত পক্ষে সুস্থ, এর বিপরীত মেরুতে অন্যদের অবস্থান।

কমলাকান্তে বেশ কয়েক ধরনের রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নিতান্ত প্রলাপের মতো থেকে শুরু করে কাহিনী সংলাপ, নাটকের আকারে কঠিন সামাজিক-নৈতিক ও আইনগত সমস্যার বিষয়ে আলোকপাত এই সব রচনায় সুলভ। শ্রেণী ও বর্ণের (দুটোই গুর্ণবাচক) এগুলো লম্ব ও সমান্তরাল, কল্পনা ও হৃদয়বৃত্তিতে উর্ধ্বমুখী এবং মননের তাৎপর্যে বিস্তৃত বা চতুঃসীমায় প্রসারিত, সর্বোপরি স্থিতিস্থাপক। বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, লোকজ-কথকতা, সঙ্গীত, আলৌকিক ভাবনা ইত্যাদি বহু ধরনের জিজ্ঞাসা এই রচনায় শিকড় সন্ধানী, কিন্তু তা প্রায়শ পরোক্ষে অবস্থানরত এবং প্রত্যেক রচনার মধ্যে রয়েছে তার এক সম্পন্ন বহুমাত্রিক সম্পর্ক। অর্থাৎ, নিবন্ধগুলো প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শিরোনামে চিহ্নিত হলেও প্রত্যেকটি রচনার পরস্পরের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অন্তর্গূঢ় সমন্বয়। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের অশেষ ধারণকৃত এবং এখানেই কমলাকান্তের অন্যতম শিল্প-সাফল্য নিহিত। স্যাটায়ার, উইট ও হিউমার যথাক্রমে বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও কৌতুকহাস্য বা নির্মলহাস্য এই প্রেক্ষাপটত্রয়ের মধ্য দিয়ে কমলাকান্তে প্রধানত কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্পৃক্ত মানুষের জীবন চর্চায় এমন কিছু আখ্যান উপহার দেন, যা শুধু নগর কলকাতায় মানুষ, তার বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সীমিত থাকে না, থাকে না কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে, শহর কলকাতায় কেন্দ্র ছাড়িয়ে কেন্দ্রাতিগ হয়ে সমগ্র বাংলার কথা বলে। এই রচনা এমন এক নিরপেক্ষ সময় ও সমাজের কথা তুলে ধরে, তুলে ধরে তার মানুষের কথা, যা কালের কঠিন বেড়া অতিক্রম করে কেন্দ্রাতিগের মতো কালাতিক্রমে সাহসী হয় অনায়াসেই। কলকাতা ও তার সীমিত মানুষের সীমানা ছাড়িয়ে কমলাকান্ত যেন সমগ্র বাংলায় প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। একারণেই প্রতিটি প্রবন্ধও শুরু হয় ছোট্ট একটি নগর কেন্দ্রিক ঘটনা বা সমস্যার বর্ণনা থেকে। যা শুরুতে থাকে সূক্ষ্ম হিসেবে, কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই তার সংকীর্ণতা ত্যাগ করে বৃহত্তরের কথা বলে ওঠে, সূক্ষ্ম থেকে স্থিতিস্থাপক সার্বিকতায় প্রাঞ্জল আকার ধারণ করে।

কমলাকান্তের প্রথম প্রবন্ধ "প্রথম সংখ্যা-একা কে গায় ওই। ?" জনৈক নৈঃসঙ্গবোধ তাড়িত কল্পনাপ্রবণ মানুষের আত্মদর্শন, গভীর করুণ এক স্রোতশীল ধারায় অবগাহিত হৃদয়ের চেতনা প্রবাহ 'কে গায় ওই ?। এই বিশ্বচরাচরে সকলেই যে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবে একা, অনন্য উপলব্ধিতে পরস্পর পরস্পর থেকে নৈকট্যহীন: এই অনভিপ্রেত কিন্তু সম্ভাব্য উপলব্ধ উদাসী বোধই এই প্রবন্ধে আভাসিত।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই প্রবন্ধ রচনা করেন তখন তাঁর বয়স অনধিক পঁয়ত্রিশ। তখন যৌবন চাঞ্চল্যে পুলিকত তাঁর পৃথিবী, তাঁর সময়। এই চাঞ্চল্য, পুলক

অতিক্রম করেই কিছুটা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে কোন এক ক্ষণিক মুহূর্তের উৎকণ্ঠ একাকীত্বকে চিরন্তন একাকীত্বে পরিণত করেছেন তিনি এই রচনায়। মানুষ যে কখনো কখনো আকস্মিকভাবে নিজে একাবোধ করে, এবং এই বোধের যে কোন স্থায়ী কার্যকারণ সূত্র পরিমাপ করা সম্ভব নয়, পাশাপাশি এই 'সুন্দরী পৃথিবীর' সৌন্দর্যের অন্তরালে সে এক নিদারুণ বেদনাবোধ আবিষ্কার করে, এটাই এই প্রবন্ধের অন্যতম মূল অনুষঙ্গ। নিত্য পৃথিবী ও অনিত্য মানুষের মধ্যে প্রসারিত সম্পর্কের অনুভবই এখানে ব্যঞ্জনামণ্ডিত হয়ে ফুটে উঠেছে। ভাষা বৈদগ্ধ্যের গুণে এই ক্ষণিক বা আকস্মিক অনুভবই চিরন্তন হিসেবে কালোত্তীর্ণ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিরল কৃতিত্ব এখানেই। 'কে গায় ওই?' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্তর্জগতের চেতন-অবচেতনের মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব যেভাবে নির্মোহ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, সেই একই ধরনের প্রকাশ দৃষ্ট হয় 'কমলাকান্তের পত্র' অধ্যায়ে সংযুক্ত 'বুড়া বয়সের কথা" (চতুর্থ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের শেষাংশের ভাষায় যেন মহাকাব্যের দ্যোতনা ঝংকৃত। যেমন, "চারিদিকেই অন্ধকার। আমার এই ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভয়ে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?" এই আর্তনাদ শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, সমকালের ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষুব্ধ আর্ত মানুষের গভীর বেদনার্ত প্রতিধ্বনি। অন্যদিকে লেখকের হিতবাদ বিশ্বাসী মনোলোকও এই প্রবন্ধদ্বয়ে সমুদ্ভাসিত।

কমলাকান্তের পঞ্চম প্রবন্ধ 'আমার মন'-শীর্ষক রচনা এ প্রসঙ্গে আলোচিত হতে পারে। নিশ্ছিদ্র বস্তুতান্ত্রিক জগতে মানুষের মনও বস্তুর মতো হারিয়ে যেতে পারে, এমনকি তাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য পাকশালা থেকে ইত্যাকার স্থানে যেতে হয়, বস্তুতান্ত্রিকতার জগতে বস্তুর বাইরে যে কোন কিছু থাকতে নেই, এই না থাকার সংকট ও দুঃখবোধই 'আমার মন' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। 'আমার মন' নানা কারণে বিশিষ্ট। উনিশ শতকের নগরকেন্দ্রিক সমাজের বাণিজ্যিক মানসিকতার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ এই প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজ কর্তৃক এদেশ শাসন ও শোষণের ফলে অর্থ যে বাঙালী মানসে এক অনিবার্য ভূমিকা সৃষ্টিতে সমর্থ এবং অর্থ যে ব্যক্তি ও সমাজের উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা সৃষ্টিতে পরিগণিত, তার পরিচয় এই প্রবন্ধে ব্যক্ত। "টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই, টাকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে" এই মন্তব্যের পর সরাসরি অর্থনীতিবিদ এ্যাডাম স্মীথ যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের উল্লেখ এই প্রবন্ধে বিদ্যমান। 'কে গায় ওই?' শীর্ষক প্রবন্ধে যে বিষয়গুলো পরোক্ষ প্রতিবিম্বিত হয়েছিল, তার প্রত্যক্ষ উল্লেখ এই প্রবন্ধে বিন্যস্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মধ্যযুগের বাংলায় শ্রেণী ও বর্ণ পৃথক ছিল। বর্ণের উচ্চস্তরের সম্মান শ্রেণীর স্তর বিন্যাস থেকে ছিল গুরুত্ববহ। শূদ্র ধনী হলেও ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই সমাজে একত্রে উপবেশনের ও আহারের ক্ষমতা

ছিল না। ব্রাহ্মণের কাছে তার সম্মান ছিল না, বা ছিল অত্যন্ত সীমিত। মূলত মধ্যযুগের বাঙালী সমাজে অর্থের প্রভাব অপেক্ষা বর্ণের অন্বয় ও ঐতিহ্যের প্রভাব ছিল দৃঢ়। কিন্তু এদেশে ইংরেজ শাসন শুরুর (১৭৫৭) প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই এই ভেদ দুর্বল ও পরিবর্তিত রূপ লাভ করে। আর্থ সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি ও বর্ণ এবং শ্রেণী উন্নীতকরণে এক মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নবাব সিরাজের পতনের (১৭৫৭) পর নিম্ন বর্ণের কিছু পরিবার যেমন, বসাক পরিবার, নন্দী পরিবার, দেব পরিবার, মল্লিক পরিবার প্রভৃতি ইংরেজ শাসক ও শোষকের আনুকুল্যে দ্রুত বিত্তশালী হয়ে 'জমিদার' বা জমিদার তুল্য ক্ষমতাবান হিসেবে সমাজ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। 'প্রধানতঃ কৃষির উন্নতি অপেক্ষা' 'এই জমিদারদের বিপুল বিত্ত শ্রাদ্ধ ও অন্ন-প্রাশনের মতো নানা কাজে ব্যয় হয়ে' তথাকথিত সামাজিক নেতৃত্বের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এই সদ্য পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি তথা ব্রাহ্মণও তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে।[৫] 'আমার মন' শীর্ষক প্রবন্ধে 'টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই' বিষয়ক উক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন দুঃখবোধের পিছনের ইতিহাস এটাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই প্রবন্ধেই বিখ্যাত কালজয়ী কূটাভাস চরিত্র 'প্রসন্ন গোয়ালিনীর' প্রথম আবির্ভাব লক্ষযোগ্য। সমগ্র কমলাকান্তে মোট সাতটি প্রবন্ধে প্রসন্নের উল্লেখ আছে। সব মিলিয়ে সেখানে কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্নের অকৃত্রিম আবেগ সঞ্জাত 'গদ্যরস ও কাব্যরসে মিশ্রিত অর্ধপ্রণয়ীর সরস মনোভাব' অস্ফুট থাকেনি।

কমলাকান্তের রূপকধর্মী প্রবন্ধের মধ্যে 'মনুষ্য ফল', 'পতঙ্গ', (বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় উপমা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইলে পতঙ্গের উপমা প্রদত্ত হয়েছে) 'বিড়াল' অন্যতম প্রধান। 'মনুষ্য ফল' কমলাকান্তের দ্বিতীয় প্রবন্ধ। মানুষের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রকৃতি তথা বৃক্ষ ও ফলের সাদৃশ্য উপস্থাপন এখানে উল্লেখযোগ্য। তবে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধে (১৩১৪) সন্নিবেশিত 'বসন্ত যাপন' (১৩০৯) শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে এই প্রবন্ধের সম্পর্ক মেরু বিপরীত। 'বসন্ত যাপনে' প্রকৃতির উত্তরসুরী হিসেবে মানুষকে কল্পনার পটভূমিতে আধুনিককালের মানুষের বাণিজ্যিক মনোভাবের সঙ্গে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের তুলনা প্রতিভাত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্য ফল' প্রবন্ধেও প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সাদৃশ্যবোধ উপস্থাপিত। কিন্তু এই তুলনা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের (উইট ও স্যাটায়ার) সমন্বয়ে নির্মিত। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে 'অসামঞ্জস্য' অনুভবের দীর্ঘশ্বাস উৎসারিত, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে রয়েছে এক ক্ষুব্ধ হৃদয়ের আত্ম-যন্ত্রণা ও দ্রোহ। তিনি ও তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ ঔপনিবেশিক সমাজে যে জীবন-যাপন ও বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন এই প্রবন্ধে নান্দনিক আলোকে তার অসারতা প্রমাণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

ব্যঙ্গ-প্রধান প্রবন্ধের মধ্যে 'বড় বাজার' (দশম সংখ্যা), ঢেঁকি (চতুর্দশ সংখ্যা), 'কাকাতুয়া' (পরিশিষ্ট) উল্লেখযোগ্য। 'বড় বাজার' প্রবন্ধে সমকালের বাণিজ্যিক মনোভাবের প্রাধান্য রয়েছে। এই প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেই ব্যঙ্গের প্রবল বিচ্ছুরণ লক্ষযোগ্য। ইতোপূর্বে আলোচিত যেমন 'কে গায় ওই?', 'আমার মন', 'মনুষ্য ফল'-শীর্ষক প্রবন্ধের নামকরণ কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। 'মনুষ্য ফল' ভিন্ন অন্যান্য প্রবন্ধের শিরোনামের মধ্য দিয়ে প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন ঈষৎ কঠিন হয়। কিন্তু 'বড় বাজার' বা 'ঢেঁকি প্রবন্ধের নামকরণের মধ্যেই বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুধাবন সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। 'বড় বাজারে' কৌতুকের থেকে ব্যঙ্গের প্রাধান্য বেশি। তবে, 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের প্রয়োগ আরো সূক্ষ্ম ও মার্জিত ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। 'কাকাতুয়া' প্রবন্ধেও পাখির নির্মোহ ও নির্লজ্জ উত্তর "আমি এদেশের সর্ব্বস্ব লুটিয়া খাইতেছি।" এখানেও ব্যঙ্গের মাধ্যমে লেখক তৎকালের ইংরেজ শাসকদের নিরঙ্কুশ শোষণের প্রসঙ্গ মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কমলাকান্তের অন্যতম প্রধান রচনা 'বসন্তের কোকিল' (সপ্তম সংখ্যা) ও 'স্ত্রীলোকের রূপ' (অষ্টম সংখ্যা)। শেষোক্ত প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃদ ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার অন্যতম লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬) কর্তৃক লিখিত। 'বসন্তের কোকিল' প্রবন্ধে প্রথমে নির্মল ও শেষে করুণ হাস্যরসের আবহ বিষয়বস্তু এক হিরন্ময় উজ্জ্বল্যে কোমল বেদনাতুর রূপ লাভ করেছে। প্রবন্ধটি উপমা-উৎপ্রেক্ষার, অলংকারের প্রয়োগে এবং বিষয়-বিন্যাসের জ্যামিতিক প্যার্টানে ও ভাষা সৌকর্যে এমন এক উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, যা 'বড় বাজার' বা 'মনুষ্য ফল' প্রবন্ধে অনেকাংশেই নেই। 'বসন্তের কোকিলে' সমাজের এবং তার মানুষের যে চিত্র উদ্ভাসিত, তা শুধু উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শোষণে পিষ্ট উৎকেন্দ্রিক সমাজের করুণ চিত্রই নয়, এই চিত্র প্রধানত সমাজের সকল সময়ের প্রতিনিধি। সমাজে সুবিধাবাদী চরিত্র হিসেবে কোকিলের প্রতীকী যেন 'ফোকলোর' আশ্রয়ী চিরকালের সেই প্রবাদতুল্য ধারণা ও বিশ্বাসবোধকেই মনে করিয়ে দিতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য যে, পতঙ্গের মতো কোকিলও বঙ্কিমের সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্যতম প্রিয় ও বহুল প্রয়োগকৃত উপমা। 'কৃষ্ণকান্তের উইলেও' কোকিলের উপমা রয়েছে। এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে রোহিণীর মানস পরিবর্তনের ইঙ্গিত কোকিলের কুহুকুহু ডাকের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত। বাংলা সাহিত্যে 'বসন্তের কোকিল' জাতীয় আত্ম-কথনমূলক প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ।

বলা প্রয়োজন, প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৩-৮৪) বিখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরে দুলাল'ও (১৮৫৫-৫৮) তৎকালের ধনিক শ্রেণীর মোসাহেব হিসেবে বসন্তের

কোকিলরূপী পরগাছাতুল্য সুবিধাভোগী শ্রেণী-চরিত্রের রূপায়ন লক্ষ করা যায়। অবশ্য সেখানে ব্যঙ্গের কষাঘাত প্রধান হলেও এই শ্রেণী-চরিত্র রূপায়নের প্রতি প্যারীচাঁদের আন্তরিক মমত্ববোধের প্রকাশও উহ্য নয়। তদ্রূপ, 'বসন্তের কোকিলে'ও সুবিধাভোগী চরিত্রের রূপায়নে লেখক বঙ্কিমের মমত্ববোধের প্রকাশ অস্পষ্ট থাকেনি।

আত্ম-কথনমূলক রচনার মধ্যে 'ফুলের বিবাহ' (নবম সংখ্যা) এবং 'চন্দ্রালোক' (ষষ্ঠ সংখ্যা) অন্যতম। শেষোক্ত প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃদ ও বঙ্গদর্শন পত্রিকার অন্যতম লেখক, 'নবজীবন' এবং 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭) কর্তৃক লিখিত। 'ফুলের বিবাহ'-শীর্ষক প্রবন্ধে কলকাতা-শান্তিপুর কেন্দ্রিক কথ্য-ভাষার রূপটি লুকিয়ে থাকেনি। যেমন: "কুসুম বলিল—ওঠ না—কি কচ্চো?" আমি বলিলাম "দূর পাগলি আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।" কুসুম ঘেষে এসে হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে কাকা?" উদ্ধৃত এই সংলাপেও কথ্যভাষার রূপটি দৃষ্ট হয়। উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের ভাষা বিন্যাস বিশ্লেষণের পাশাপাশি যদি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-৮৯) 'পালামৌ' (১৮৯৩) ও 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) গ্রন্থের ভাষার প্রতি দৃকপাত করা যায়, তাহলে সেখানেও 'সারল্য' ও 'কৌতুকভঙ্গির' মধ্যদিয়ে কথ্যভঙ্গির দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। এমন কি সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে, এই কথ্যভঙ্গির নিকটতম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রের' (১৮৮৮-৯৫) অনুপম পত্রাবলীতে এবং 'জীবন স্মৃতি'র স্মৃতিমর্মর বাণীভঙ্গিতে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের কোন কোন প্রবন্ধে ভাষার যে কথ্যরূপের প্রয়োগ আছে, তা কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-৭৩) 'হুতোম প্যাঁচার নকসায়' (১৮৬২) কলকাতার স্থানীয় কথ্যরূপের যে শক্তিশালী প্রয়োগ বিদ্যমান, তার বৈশিষ্ট্য ও ধারা থেকে ভিন্নধর্মী।

আত্ম-জৈবনিক ধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'একটি গীত' (দ্বাদশ সংখ্যা)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' শীর্ষক গ্রন্থে এই প্রবন্ধ রচনার বিষয়ে আলোকপাত রয়েছে।[৬] উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র বংশগতভাবে বৈষ্ণব ধর্মের অনুরাগী ছিলেন। তবে, যৌবনে ইয়ং বেঙ্গল সদস্যদের মতো কিছুটা উৎকেন্দ্রিক জীবনচর্চায় আগ্রহ থাকলেও পরিণত বয়সে তিনি স্বধর্মে অনুরাগী হন। অবশ্য প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে দীক্ষা নিয়ে নির্দিষ্ট তন্ত্র-মন্ত্র জপ করাসহ প্রচলিত পদ্ধতির আদর্শানুযায়ী ধর্ম পালনে তিনি আমৃত্যু বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ধর্ম নিয়ে ভেবেছেন. যৌক্তিকতার আলোকে ধর্মকে বিশ্লেষণ করে নতুন ব্যাখ্যা প্রদানে

সচেষ্ট হয়েছেন, এমনকি বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন নিজ সম্পাদিত মাসিক প্রচার (১২৯১) পত্রিকায়। 'একটি গীত' সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ আলোচনার ক্ষেত্রে অবশ্য এতসব আলোচনার সুযোগ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সংগীতে বিশেষত কীর্তনের অনুরাগী ছিলেন এবং একটি বিখ্যাত কীর্তনের সুরের মায়াজালে কোন এক রাতে তাঁর যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই বর্ণনা এই প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। তবে, এই লেখার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ইতিহাসের আলোকে আর্যের উত্তরাধিকার প্রভাবিত বাঙালীর আত্ম-অন্বেষণের কাহিনী। এ প্রসঙ্গে, দুঃখী কমলাকান্তের প্রতিচ্ছায়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবন চরিত কই? কীর্ত্তি কই?... সুখ গিয়াছে-সুখ চিহ্নও গিয়াছে? বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি (সেই) শ্মশানভূমির প্রতি চাই।" দেশপ্রেম, ধর্মপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ এই প্রবন্ধে একইসূত্রে গ্রথিত এবং এই প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে ধর্মপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ দেশপ্রীতি বা দেশপ্রেমে বিলীন হয়ে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এ সূত্রে বলা প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এই বাংলায় প্রথম বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের চিত্র হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) কবিতায় এবং রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) কর্মে ও লেখায় মূর্ত হয়েছিল। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে 'হিন্দুমেলার' (১৮৬৭-৮০) প্রবল প্রভাবে প্রধানত নগর কলকাতার নাগরিক সমাজ আলোড়িত হয়। এই হিন্দু মেলাতেই নাট্যকার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ভারতের (?) প্রথম স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন (১৮৭৩) করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'হিন্দু মেলার' কার্যাবলী দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্রের আলোড়িত হওয়ার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই তাৎপর্যেই বঙ্কিমের গদ্যে বিশেষত: 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসে প্রথম স্বাদেশিকতা বা দেশপ্রেমের প্রকাশ অসম্ভব কিছু নয়। অবশ্য এই সবই নিতান্ত যুক্তিসংগত অনুমান। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই জীবনীকার এবিষয়ে অর্থাৎ বঙ্কিমের উপর হিন্দুমেলার প্রভাব বা বঙ্কিমের সঙ্গে হিন্দুমেলার সম্পর্ক বিষয়ে নীরব। তবে, উচ্চ-পর্যায়ের সরকারী চাকুরিজীবী হিসেবে এবং প্রত্যক্ষভাবে তিনি বিচারকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন বিধায় স্বাদেশিকতাবোধ উজ্জীবনকারী 'ন্যাশনাল' নবগোপাল মিত্র (১৮৪০?—১৮৯৪) ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত নিরঙ্কুশ বাঙালীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে হিন্দুমেলার সঙ্গে বঙ্কিমের প্রকাশ্য সম্পর্ক নির্মাণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। যদিও এই সময়ের (১৮৬৩) কিছু পূর্বে তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের (১৮৫১) এবং কলকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ও সভ্য তালিকাভুক্ত হন। এছাড়া, বঙ্কিমের চিন্তায় দেশপ্রেমের রূপটি কর্মনিষ্ঠা অপেক্ষা ভাবনিষ্ঠা বা আত্মনিষ্ঠায় বেশি পর্যবসিত। এই প্রেক্ষাপটে আরো বলা প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক কমলাকান্ত রচনার দশক সময় পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য ও সনেটে দেশপ্রেমের এক সার্বিক পরিচয় মেলে, যে পরিচয় করুণ এক

উদ্বেল আকুলতায় উপস্থাপিত। অতঃপর বঙ্কিমের সাহিত্যে দেশপ্রেমের পরিচয় লক্ষযোগ্য। তবে, বঙ্কিমের দেশপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যতীত সমকালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' (১৮৫৩) পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৪-৬১) দেশপ্রেম ও আদর্শের সম্পর্ক প্রায় বিপরীত। নওয়াব আবদুল লতিফের (১৮২৮-৯৩) ভাষ্যানুযায়ী 'এই দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহার (হরিশচন্দ্র) আদরের পাত্র ছিল।' অধিকন্তু, নীলচাষ বন্ধের আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা যথার্থ গৌরবদীপ্ত ও দেশপ্রেমের মর্যাদাবহনকারী। দুর্ভোর পীড়িত সকল সম্প্রদায়ের জনগণের আর্থিক সামাজিক উন্নতিতে তিনি দেশপ্রেমের অনবদ্য পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।[খ] তথাপি, মধুসূদন ও হরিশচন্দ্রের যথাক্রমে কাব্যে ও কার্যাবলীতে দেশপ্রেম প্রকাশের যে ধরনের পরিচয় বিধৃত, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের আদর্শ ও পরিচয় তদ্রূপ না হলেও (যা ইতোপূর্বে উল্লেখযোগ্য) তাঁর প্রবন্ধে ইতিহাসের আলোকে দেশ ও দেশপ্রেমের নিষ্ঠ আদর্শরূপ প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে 'দেশের দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়।' লোক রহস্য'-শীর্ষক গ্রন্থের প্রবন্ধাবলীতেও এই দেশপ্রেমের প্রাথমিক রূপ প্রত্যক্ষ করা গেলেও 'কমলাকান্ত' এবং আরো পরবর্তীকালে রচিত 'বিবিধ প্রবন্ধের' (১৮৮৭) গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধে দেশাত্মবোধের ক্রমশ একটা সংহত ভাব সহজেই আবিষ্কৃত হয়। 'লোকরহস্যে' দেশপ্রেম যেখানে ব্যঙ্গের বা বিদ্রূপের প্রাধান্যে স্থাপিত, কমলাকান্তে তা ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপের প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের আলেখ্যের আশ্রয়ে আত্ম-অন্বেষণজাত এক করুণ পরাভবের বেদনায় প্রকাশিত। তবে একথাও সত্য যে, বঙ্কিমের আত্ম-অন্বেষণ এখানে কোন একটি বিন্দুতে স্থির হয়ে থাকেনি। 'স্বভাবজ আত্ম-কৌতুহলের' তাগিদে এই প্রকাশই অবশেষে 'বিবিধ প্রবন্ধের' কোন কোন প্রবন্ধে সম্পূর্ণ ইতিহাস চেতনার আশ্রয়ে বাঙালীর গৌরবদীপ্ত অতীত অন্বেষণের মধ্য দিয়ে বর্তমানের বাঙালীর ঔপনিবেশিক মানসিকতাকে প্রতিহত করতে উদ্যত।

'একটি গীত' ও 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে দেশের সার্বিক দৈন্য ও বিজিত অবস্থা দর্শনে লেখকের যে নিদারুণ দুঃখবোধ ও আত্মবিলাপ ধ্বনিত হয়েছে, তারই বিপরীত চূড়ান্ত বঙ্গ ও বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে দেশের তৎকালের তোষণ-সম্পৃক্ত এক মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিচর্চার রূপক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়েছে 'পলিটিক্স্' শীর্ষক প্রবন্ধে। তথাকথিত রাজনীতির স্বরূপ প্রকাশে 'পলিটিক্স্' অনন্যসাধারণ। এই প্রবন্ধে লেখক দুধরনের পলিটিক্সের উল্লেখ করেছেন, "এক কক্কুর জাতীয় আর এক বৃষ জাতীয়।" নির্মম ব্যঙ্গ ও নির্মল কৌতুকের মাধ্যমে বিশ্লেষিত রাজনীতির এই শ্রেণীভেদ অবশ্য অধুনাকালেও স্বীকার্য। রাজনীতি সম্পর্কিত এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ লেখকের সমৃদ্ধ মননের পরিচয়বাহী।

অবশ্য 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধেও তৎকালের রাজনীতির প্রতি ক্ষুব্ধ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'পলিটিক্স্' প্রবন্ধে নির্মল হাস্যরসের উপাদান বেশি হলেও 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে ব্যঙ্গের প্রভাবই বেশি। সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র জীবদ্দশায় কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে অংশগ্রহণ করেন নি। শুধু ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন (ভারত সভা ১৮৭৬) প্রতিষ্ঠাকালে একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। কংগ্রেস (১৮৮৫) সম্পর্কেও তাঁর স্বতন্ত্র মনোভাব পোষণের সংবাদ সহজলভ্য।[৭]

কমলাকান্তের শ্রেষ্ঠ 'পরিচ্ছন্ন স্যাটায়ার ধর্মী' প্রবন্ধ 'বিড়াল' (ত্রয়োদশ সংখ্যা)। ১৮৭২-৭৫ সালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তিনটি বিখ্যাত প্রবন্ধ রচনা করেন। 'বিড়াল' (১২৮১) প্রবন্ধটি তার মধ্যে তৃতীয়। এর অগ্রগামী পর্যায়ের দুটি প্রবন্ধ হলো 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১২৭৯) ও 'সাম্য' (১২৮০)। বিড়ালের বিষয়বস্তু অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য। 'বিড়াল' প্রবন্ধে রয়েছে সাম্যবাদী দর্শনের রূপকধর্মী রূপায়ন বা উপস্থাপন। এই প্রবন্ধে ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয় তথা বাঙালীদের প্রতি শোষণজাত উত্তেজনার প্রকাশ অপেক্ষা স্বজাতীয়দের মধ্যে সবল এক শ্রেণী কর্তৃক দুর্বল অন্য শ্রেণীর উপর মাৎসন্যায়ের বিচিত্র চিত্রই নগ্নভাবে প্রকাশিত। এই প্রবন্ধে শোষণকার্যে একনায়ক রাষ্ট্রযন্ত্র নয়, সামাজিক শ্রেণী ও প্রচলনীতি। অপর দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্যে' এই তত্ত্ব ও তত্ত্বসম্পর্কিত বোধের আরো শ্রেণী ও বর্ণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সবিস্তারে প্রকাশ ঘটেছে। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে কৃষকের ফসল উৎপাদন, বণ্টন, ইংরেজ সৃষ্ট ভূমি সংক্রান্ত সকল আইন (যেমন: ব্রিটিশরাজ্য কালে ভূমি সংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে' দ্র. রচনাবলী, পৃ: ৩০৭) ও শ্রেণীগত শোষণ এবং 'সাম্যে' সমাজের সর্বস্তরের সামাজিক বিভেদ বর্ণ, শ্রেণী ও অর্থনীতি সম্পর্কিত শোষণের রূপ প্রকাশিত।[৮] এই ত্রয়ী প্রবন্ধেই শব্দ নির্বাচন, ভাষা বিন্যাসের পটভূমি নির্মাণে এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও প্রকাশে নাটকীয়তা রক্ষিত। সংহত আবেগের মার্জিত বিন্যাসে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অতুলনীয়। 'হিতবাদের' নিরিখে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে সীমারেখা ও যে সম্পর্ক তিনি এখানে প্রকাশ করেছেন, তা উনিশ শতকের মধ্যভাগের পটভূমিতে অবশ্যই মৌলিকতার দাবী রাখে। একদিকে ক্রোধ ও ঘৃণা, অন্যদিকে আবেগ ও রোমান্টিকতার সমন্বয়ে এই প্রবন্ধের ভাষা ও বিষয়বস্তু এক অপূর্ব অচ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্যদিয়ে শৈল্পিক সার্থকতা লাভ করেছে।

বিড়াল শোষিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন সৃষ্ট হতে পারে যে, মার্কসীয় অর্থতত্ত্ব ও শ্রেণী-সমাজ দর্শনের কোন প্রভাব 'বিড়াল' কিংবা বিশেষভাবে

'বঙ্গদেশের কৃষক' বা 'সাম্যে' রয়েছে কি না? সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র মার্কসীয় দর্শন বা চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিংবা মার্কসীয় অর্থতত্ত্ব পাঠ করেছিলেন কি না, এ বিষয়ে বঙ্কিমজীবনীকার নীরব। তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় মার্কসীয় চিন্তাধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়জাত সম্পর্কের উল্লেখ না থাকলেও কার্ল মার্কসের (১৮১৮-৮৩) সমকালের অন্যতম বিখ্যাত জর্মন দার্শনিক মার্কসের অন্যতম সুহৃদ ফুয়রাবাকের উল্লেখ তাঁর 'বুড়া বয়সের কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে রয়েছে। লুডউইগ ফুয়রাবাকের (১৮০৪-৭২) উল্লেখ ব্যতীত 'সোসালিস্ট', 'কমুনিষ্ট', 'কমুনিজম' প্রভৃতি তত্ত্ব ও শব্দের সঙ্গে যে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল, তা যথাক্রমে কমলাকান্তের 'বুড়া বয়সের কথা' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' এবং 'বাহুবল ও বাক্যবল' (রচনাবলী দ্র. পৃ. ১০০, ৩৩৯, ৩৬৪) প্রবন্ধে ব্যক্ত।

অতএব, এ প্রসঙ্গে স্থূলভাবে ধারণা করা যায়, উপর্যুক্ত প্রবন্ধসমূহে অন্তর্ভুক্ত সাম্যবাদ সম্পৃক্ত চিন্তাধারার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ঘটে, ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক জ্যাঁ জ্যাক রুশো (১৭১২-৭৮), ফরাসী সমাজতাত্ত্বিক শাল ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) লুই ব্লা (১৮১১-৮২) ব্রিটিশ সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৫৫৮) প্রমুখের পৃথুল সমাজতত্ত্ব বা সামাজিক গণতন্ত্র, 'যার উল্টো পিঠে শ্রেণী সংগ্রামের নির্বাণ বা বিরোধিতা রয়েছে' এই ধরনের তাত্ত্বিকদের গ্রন্থপাঠ থেকে (রচনাবলী দ্র. সাম্য/২য় পরিচ্ছেদ)। এই সাম্যবাদ চিন্তাধারা দৃঢ় ও বিস্তৃত হয় জেরেমি বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) হিতবাদ বা উপযোগিতাবাদ এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-৭৩) প্রধানত 'অন লিবার্টি' (১৮৬৯) শীর্ষক গ্রন্থ পঠনে। উল্লিখিত উপলব্ধির প্রভাব 'সাম্য প্রবন্ধ রচনার প্রাক্কালে আরো পরিমার্জিত ও দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত হয় ইতোপূর্বে যৌবন প্রারম্ভে পঠিত ইমানুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) 'সিনথেটিক ফিলসফি' ও অগাস্ত কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) ধ্রুববাদ তত্ত্বের সমন্বয়ে। কান্টের মতে, 'বুদ্ধি বা যুক্তি ও অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে যে জ্ঞান তৈরি হয়', বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সেই জ্ঞানচর্চাই হিতবাদ ও ধ্রুববাদে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল এবং এই সমন্বিত তত্ত্বের মাধ্যমেই পশ্চিমের আধুনিক যুক্তিবাদী-হিতবাদী-সাম্যবাদী চিন্তাধারায় পোক্ত প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেন। তাই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় বিষয়টি এভাবে বলা যায়, "বঙ্কিমের কল্পনাময়ী দৃষ্টি তাঁহার জ্ঞানময় আলোচনাকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল।"[৯]

এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ চিন্তানায়কের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টির (বিপ্লব?) অনুকূলে ছিলেন না। বিশেষত লুই ব্লা ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৯) অন্যতম 'বামবাদী ঐতিহ্যের নায়ক' জ্যাঁ জ্যাক রুশোর শিষ্য ম্যাক্সিমিলি অঁ্যা দ্যঁ রোবসপিরিওর (গিলেটিনে

মৃত্যু: ১৭৯৪) প্রতি আকর্ষিত হয়েও 'প্রকাশ্যে শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন'। (বঙ্কিমের সাম্য প্রবন্ধে রুশো, লুই ব্লা, দাঁতো, রোবসপিরিওর, সেন্ট সাইমনসহ আরো অনেকের উল্লেখ আছে)। সামাজিক গণতন্ত্রবাদী রবার্ট ওয়েন ধনী পিতার প্রাসাদ ছেড়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে পাতার কুটিরে আশ্রয় নিলেও বিপ্লবের বিষয়ে তাঁর ইতিবাচক কোন উদ্যোগের কথা জানা যায় না। যদিও স্বয়ং ফিড্রেরিখ এঙ্গেলস 'এই ইউটোপিয়ান সোসালিস্টের প্রতি ছিলেন সশ্রদ্ধ'। অন্যদিকে টমাস কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস বা The French Revoluton (১৯৩৭) গ্রন্থ লিখলেও তাঁর সমবেদনা ছিল বিপ্লবীদের প্রতি নয়, অভিজাতদের প্রতি। এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-৯৭) কর্তৃক ফরাসি বিপ্লবের দু'বছর পর লিখিত Reflections on the French Revolution (১৭৯০) গ্রন্থে দেখা যায়, বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর কোন ইতিবাচক আবেগ প্রকাশিত হয় নি, বিপ্লব ও বিপ্লবীদের ব্যাপারে 'মানুষের অধিকার নিয়ে একটা আওয়াজ খাড়া করার মতো' স্থূল মন্তব্য করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। মূলত তাদের সকলের মধ্যেই ছিল কমবেশি 'রক্ষণশীলতা' ও 'ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য'। তাই উল্লিখিত তাৎপর্যের প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখেছেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।... বন্দোবস্তের ফলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিতেছে, এখন সুনিয়ম করিলে তাহার যতদূর প্রতিকার হইতে পারে, তাহাই হইক" (রচনাবলী দ্র. পৃ. ৩০৯-১০)। এই তথ্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, "বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তচর্চার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না"[১০] বলেই মার্কসীয় অর্থতত্ত্ব ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের উল্লেখ তাঁর রচনায় পাওয়া যায় না।

অবশ্য এখানেই উল্লিখিত বিষয়ে শেষ কথা নয়। যৌবনে একসময়ের ঘোরতর নাস্তিক ও যুক্তিবাদে আস্থাশীল বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে (এর সূচনা চল্লিশ বছর বয়স থেকে) স্বআবিষ্কৃত উপাসনা প্রণালীর অধীনে ধর্মপালনে ও হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে, 'সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিমের সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে আবির্ভাব ঘটলেও তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি হিন্দু হিসেবে।'[১১] তাই পরবর্তীকালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 'সাম্য' সম্পর্কে তখন তাঁর মন্তব্য ছিল, "সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না। প্রবন্ধ পুস্তকেও অনেক ভুল, সেটাও ছাপাব না।" জন স্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিবাদকে অস্বীকারার্থে বলেছিলেন, "এক সময় মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে", (বঙ্কিম প্রসঙ্গ দ্র. পৃ. ১২২)। কিন্তু উল্লিখিত বক্তব্য প্রদান সত্ত্বেও যৌবনে আহৃত যুক্তিবাদ, হিতবাদ ও ধ্রুববাদের প্রভাব যে তিনি

পরবর্তীকালেও অস্বীকার করতে পারেন নি, তা 'কৃষ্ণচরিত' (১৮৮৬) উত্তর 'ধর্ম্মতত্ত্ব (১৮৮৮) রচনাকালেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই তিনি এই শেষোক্ত প্রবন্ধ গ্রন্থের একস্থানে নিজের অজান্তেই বলে ওঠেন, "সমবায়ই সুখ" (রচনাবলী দ্র. পৃ. ৬০০)। যা কি না, সনাতন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের বর্ণ ও শ্রেণী চরিত্র বিরোধী আধুনিক চিন্তারই স্বাক্ষরবাহী।

উল্লেখযোগ্য যে, আরো পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও এই হিতবাদী ভাবনার প্রভাব অস্পষ্ট থাকেনি। যেমন, তিনি যখন রামমোহনের অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে একথা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেন যে, "ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায় ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু" (চারিত্র পূজা; পৃ. ৬৬) তখন রবীন্দ্রনাথকে বঙ্কিমচন্দ্র অথবা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের (১৮৪৩-১৯৩২) উত্তরসুরী হিতবাদী প্রবক্তা হিসেবে গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

কমলাকান্ত গ্রন্থের প্রাক-সমাপ্ত রচনা 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ পেশাসূত্রে আদালত, উকিল, আইন ইত্যাদি বিষয়ে ছিল দীর্ঘ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞাতারই এক তুমুল নির্মল হাস্যরসাত্মক চিত্র 'কমলাকান্তের জোবানবন্দনী।' এই নাট্যধর্মী রচনার সংলাপে নির্মল হাস্যরসের পূর্ণ প্রকাশ থাকলেও এই বিষয় বর্ণনার আড়ালে কমলাকান্তের ফল্গুধারার মতো এক বিষাদ, এক বিপন্ন মানস প্রবাহের অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল। অধিকন্তু, এই প্রবন্ধের উপসংহারে 'বিড়াল' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুকরণে সাম্যবাদের পরিচয় প্রকৃষ্ট। তবে, এটাও সত্য যে, 'কমলাকান্তের জোবানবন্দীর' শেষ পর্যায়ে সেই সরল তঞ্চকতা ঘৃণাকারী, সংসার বিমুখ, প্রীত-অভিলাষী, সামান্যে সন্তুষ্ট, কল্পনাপ্রবণ কমলাকান্তকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়। কেননা লেখকের ভাষায় "মানুষটা নিতান্ত খেপিয়া গিয়াছে।" এ যেন তৎকালের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও সংশ্লিষ্ট দেশীয় পরগাছা শ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিকতায় ক্ষুব্ধ লেখক বঙ্কিমেরই অন্তর্জ্বালার বাণীবীক্ষণ।

"যে আশ্চর্য শক্তি দ্বারা তুলাকে লৌহ, লৌহকে তুলা বিবেচনা করা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে।" কমলাকান্তে অন্তর্ভুক্ত 'তৃতীয় সংখ্যা— ইউলিটি বা উদর দর্শন' শীর্ষক রচনায় জেরেমি বেন্থামের হিতবাদ দর্শনের তথাকথিত চর্চায় আগ্রহী এক শ্রেণীর আদর্শহীন, নীতিবোধ পরিবর্তন প্রিয় মেরুদণ্ডহীন বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি বঙ্কিমের এই যে মূল্যায়ন, তাকে যদি তৎকালের বাস্তব প্রীতিবোধের মেরুকরণের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে এর বিপরীত মেরুতে হৃদয়ের আবেগ-চেতনা ও বিস্তৃত কল্পনার মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ হিসেবে 'কে

গায় ওই?', 'একটি গীত', 'ফুলের বিবাহ' অথবা 'আমার দুর্গোৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য হতে পারে। বিশেষত 'আমার দুর্গোৎসবে দেশপ্রেমের প্রেক্ষাপটে অতীতের বিজয়দর্পী বাঙালীর ইতিহাস চিত্রের যোজনা ঘটেছে। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র বংশগতভাবে 'রাধাবল্লভের পূজারী', তথাপি এই প্রবন্ধে জাতীয় জাগরণের লক্ষ্যে শাক্তধর্মের শক্তি সাধনাকে দেশপ্রেমের উদাত্ত আবেগের প্রতীকী করতে চেয়েছেন দেশমাতৃকার বর্তমান দুর্গতিনাশের জন্যই। 'দুর্গ শব্দের অন্যতম অর্থ দুঃখ বা দুর্গতি।' যিনি নানাবিধ দুর্গতি নাশ করেন, তিনিই দুর্গা। তিনি নারায়ণীও বটেন। তাকে স্মরণ মাত্রই মানবকুলের দুর্গতি নাশ হয়। মধ্যযুগে রচিত বিভিন্ন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও চণ্ডী তথা দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।[৩ক] তাই, দেবী দুর্গা, যার দশগুণের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠগুণ 'দুর্গতিনাশিনী' রূপ এবং দেশমাতৃকার কল্পনায় দেবীকে আবাহন, দেবী ও দেশকে অভিন্ন অদ্বৈতরূপে কল্পনা তথা পূজা করা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যবোধ আশ্রিত প্রাগ্রসর চিন্তাচেতনারই স্মারক। এই ধরনের চিন্তা-চেতনায় অধুনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃৎ হলেও তিনি এই বিষয়টি গ্রহণ করেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মহাভারত (বিরাটপর্ব) ও চণ্ডীমঙ্গল উপাখ্যানের আলোকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগরের যুগে বাংলা গদ্য অনেক উন্নতি করিল বটে, কিন্তু আদর্শ বাঙ্গালা সৃষ্টি হইল না। আদর্শ বাঙ্গালা সৃষ্ট হইল বঙ্কিম-যুগে।"[৪] এই বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি 'আদর্শ বাঙ্গালা গদ্য সৃষ্টিকারী' হিসেবে উল্লেখ করা না হলেও এই বক্তব্যের অন্যতম প্রধান অর্থ যে বঙ্কিমচন্দ্রই আদর্শ বাঙ্গালা গদ্য সৃষ্টিকারী, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবে, এই বাক্য নির্মাণে কিছুটা আবেগের প্রকাশ থাকলেও সত্য যে, রামমোহন রায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (রেভারেন্ড: ১৮১৩-৮৫), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২-৯১) 'মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে' 'হৃদ্বোধক কথা ব্যবহার ও মনোরঞ্জক শিক্ষা বিস্তার' কেন্দ্রিক সাহিত্য সাধনা-উত্তর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬) ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতেই বাংলা ভাষার গদ্য সাহিত্যের আদর্শরূপ সৃষ্ট হয়। যদিও এই সৃষ্টি 'প্রয়োজন ধর্মের প্রাধান্য' রঞ্জিত, তথাপি 'শিল্প-ধর্মের অস্তিত্ব' সেখানে ক্রম-বিকাশমান ছিল এবং বর্তমানকালে এই গদ্যে প্রয়োজন ধর্মের অস্তিত্ব লুপ্ত না হলেও বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত সেই উনিশ শতকের গদ্যের ভিত্তির উপরেই যে বর্তমানের গদ্য শিল্পের অনেকাংশে দাঁড়িয়ে আছে, তা অনস্বীকার্য।

কমলাকান্তের গদ্যের প্রধান গুণ এর গম্ভীর তরঙ্গায়িত ধ্রুপদী বাঁধুনি। এই গদ্যের বর্ণনাঅংশ প্রধানত তৎসম শব্দ ও দীর্ঘ-প্রলম্বিত বাক্যে গঠিত হলেও

সংলাপে সাধারণত সংক্ষিপ্ত কথ্য বাক্যের সাধুভঙ্গির আশ্রয়ে প্রয়োগ দ্রুতভাবে ঘটেছে। কখনো একটি ক্রিয়া বা ক্রিয়া বিশেষ্য বা বিশেষণের সাহায্যে একাধিকবার দীর্ঘ বা হ্রস্ববাক্য নির্মাণের মূল লক্ষ্য থাকে পাঠকের কল্পনা ও আবেগকে আরো তীব্র এবং টান্ টান্ প্রসারে সহায়তা করা। এছাড়া, 'স্নিগ্ধ বুদ্ধির দীপ্তি', 'দার্শনিকের কল্পনা ও প্রত্যয়ের' সঙ্গে 'রসের হাসি' ও 'চিন্তার আলোও' সেখানে সক্রিয়। তাই সমালোচক সঙ্গত কারণেই যখন বলেন, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লক্ষ কোটি শব্দ দিয়ে লিখিত হয়েছে বহু পৃষ্ঠা গদ্য।... কিন্তু কমলাকান্ত তো আর লেখা হল না[১২]", তখন শিল্পচর্চার প্রাঙ্গনে একই ধরনের স্টাইল বা রীতির একাধিক শিল্পী অনাবশ্যক, এই নির্মোহ সত্য মেনে নিয়েই তবু স্বীকার করতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের গদ্য অবিরলভাবে হৃদয়ে এক নতুন কল্পনার দ্বার উন্মোচনে সমর্থ। মূলত 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে যে ধরনের গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারই আরো প্রসারিত রূপ কমলাকান্তের 'গদ্য-শরীর'। এই গদ্যে রয়েছে ধ্বন্যাত্মক 'গুণধারণশীল' শব্দের প্রাঞ্জল উপস্থিতি। কাব্যিক ব্যঞ্জনা, অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি করে এমন উপমা, প্রবাদ, রূপকের কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো তির্যক প্রয়োগ। ফেনিল বা উচ্ছ্বাসমুখর না হলেও গভীর বর্ণাঢ্য গীতল আবহ সৃষ্টিতে এই গদ্য বিশেষ উপযোগী। তবে, বিদ্যাসাগরের গদ্য বিন্যাসের প্রতি যে দ্রোহ প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে উচ্চকিত, সেই দ্রোহেরই প্রচ্ছায়া কমলাকান্তের ভূমিকায় লক্ষযোগ্য। কিন্তু সত্য যে, এই ভূমিকার ভাষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের প্রবন্ধসমূহের ভাষা গঠনে ও বিন্যাসে পার্থক্য প্রবল। যেমন: কমলাকান্তের এই ভূমিকা কথনে পাঁচটি অনুচ্ছেদ আছে, তার মধ্যে প্রথম চারটি অনুচ্ছেদে কমলাকান্তের সার্বিক পরিচয় বর্ণিত। শেষ অনুচ্ছেদে ভীষ্মদেব খোশনবীস 'লোক-হিতৈষার প্রাবল্য হেতু' এই দপ্তর প্রচারে আগ্রহী হয়েছেন, তার কারণও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। ভীষ্মদেবের পদবী খোশনবীস, বলা বাহুল্য বহু প্রচলিত পদবী এটি নয়। শব্দটি ফার্সি, যার অভিধানিক অর্থ হাতের লেখা সুন্দর। বঙ্কিমচন্দ্রের পর এই শব্দটির উল্লেখযোগ্য ব্যবহারকারী কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। ব্যতিক্রমী অভিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই পদবীগত আবহ নির্মাণ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য হতে পারে।

কমলাকান্তের এই ভূমিকায় মোট পাঁচটি অনুচ্ছেদে প্রায় ৩৫৪ শব্দের প্রয়োগে যে চিত্রমালা নির্মিত, তা প্রথমত পাঠকের মনে অনাবিল ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে সার্থক। এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও চরণ প্রয়োজনানুগ সংক্ষিপ্ত ও নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাযুক্ত। একই ক্রিয়াপদ দিয়ে চরণ সমাপ্ত করার একাধিক দৃষ্টান্ত নেই। ব্যাকরণের বিচারে নিত্যবৃত্ত অতীত, নিত্যবৃত্ত বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমানকালের প্রয়োগে শব্দমালা ব্যবহারের হেতুতে পাঠকের চলমান জীবনবোধের সঙ্গে

কমলাকান্তকে অনিবার্যভাবে সংযোজন করতে সাহায্য করে। যদিও, মধ্যবর্তী দুটি অনুচ্ছেদে অতীতকাল জ্ঞাপক ক্রিয়া ব্যবহারের প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও তা পাঠককে সুদূর অতীতে পৌছুতে সাহায্য করে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রায় ৩৫৪টি শব্দমালা সূচনার পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিদ্যমান। প্রথম থেকে পঞ্চম অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যথাক্রমে ৭৬, ৯৬, ৭৪, ৫২, ৫৪ এবং শেষে ২টি শব্দ প্রযুক্ত। এর মধ্যে আরবি-ফার্সি শব্দ হলো সাহেব, সুবো, দস্তখত, তালুক-মুলুক, বহি, সরকারী, কাবার (মাস-কাবার), আফিম, দপ্তর, কাগজ, বখ্‌শিশ, খোশনবীস ইত্যাদি। একটি পর্তুগীজ শব্দ আছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে, তা হলো কেরানী। তাছাড়া এখানে ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দ হচ্ছে ইংরেজি, আপিস, বিল, পে-বিল ইত্যাদি। ব্যবহৃত মিশ্রশব্দসমূহ হচ্ছে, মাসকাবার, পে-বিল। মাস>সংস্কৃত, কাবার>আরবি বা পর্তুগীজ। এই ভূমিকায় প্রায় ২২টি আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, পর্তুগীজ ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। এই হিসেব নিতান্ত সাধারণভাবে করা। অর্থাৎ মাত্র ৬% শতাংশের কিছু বেশি বিদেশী শব্দ এখানে খাঁটি বা রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত। তবে, এই ভূমিকায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার বেশি না হলেও অকিঞ্চিৎকর নয়।

উল্লিখিত সূচনা পরবর্তী প্রবন্ধ 'একা কে গায় ওই?' আনুমানিক প্রায় ৬৮২টি শব্দে সজ্জিত এই প্রবন্ধ পূর্বোক্ত ভূমিকা বা সূচনার থেকে দ্বিগুণ। পূর্বোক্ত ভূমিকার হিসেব অনুযায়ী ২২টির বেশি এবং ৪৪টির বেশি নয়, এমন কিছু বিদেশী শব্দ এখানে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এই প্রবন্ধ শরীরে শব্দের উৎস বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কোন বিদেশী শব্দ এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। এই হিসেব 'বড় বাজার' প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। এই প্রবন্ধে আনুমানিক প্রায় ১৭০২টি শব্দ রয়েছে। এর মধ্যে আনুমানিক প্রায় ৭৬টি বিদেশী শব্দ রয়েছে। অর্থাৎ প্রায় পৌনে পাঁচ শতাংশ বিদেশী শব্দ প্রযুক্ত। তবে বিদেশী শব্দমালার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে ইংরেজি, সংখ্যায় প্রায় ৬৩টি। এছাড়া, একটি শব্দ আছে উড়িয়া, যথা: মিন্‌সে ও একটি শব্দ আছে হিন্দি যথা: কলু। সার্বিক বিচারে এখানে আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার অল্প। মূলত এ সমস্তই স্থূল গাণিতিক হিসেব। শিল্প-সৃষ্টির মাধ্যমসমূহ কখনো কখনো গাণিতিক পারম্পর্য রক্ষাসূত্রে পূর্বনির্ধারিত রেখাপথ ধরে অনুসৃত হয় না। তবু বলা যায় বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে শুধুই আত্মকথনের মধ্যদিয়ে 'ভাবনার ভাস্কর্য' নির্মাণ করেছেন, সেখানে বিদেশী শব্দের প্রয়োগ ঘটেনি বা নিতান্তই অল্প। কিন্তু, যে প্রবন্ধে সমকালের নগরজীবনের চিত্রায়ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে, সেখানে বিদেশি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।

অতএব, ধারণা করা যেতে পারে, মনের তাৎক্ষণিক 'প্রাণ খুলে কথা বলার বাণী ভঙ্গিতেই' তাৎক্ষণিক সৃষ্ট ভাবাদর্শের প্রকাশই এখানে মুখ্য। তাই প্রয়োজনানুসারে কখনো আরবি-ফার্সি শব্দ মিশ্রিত ভাষারীতি, কখনো তৎসম

ধ্রুপদী ধ্বনি গম্ভীর ভাষারীতি বক্তব্য বা বিষয়ের স্বাভাবিক প্রকাশের অনুষঙ্গই এখানে অনিবার্যভাবে স্থান করে নিয়েছে। তবে, প্যারীচাঁদ বা বিদ্যাসাগর কর্তৃক অনুসৃত রীতি এখানে হুবহু ব্যবহৃত হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে এই রীতিদ্বয় পরস্পর মিশ্রিত হয়ে আরো গতিশীল, তীক্ষ্ম, নির্মোহ রূপ লাভ করেছে শিল্পীর বিষয়বস্তুর মনোনয়নজাত মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে ভাষার সাধুভঙ্গির বিন্যাসের উপর কথ্যভঙ্গির প্রলেপ যেমন চরিত্রের দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যময় ভাব প্রকাশকে বিশিষ্ট করে তুলেছে, তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তেও প্যারীচাঁদ উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত রীতি ব্যবহৃত হয়েছে বহুলভাবেই। 'বড় বাজার', 'কি লিখিব', 'পলিটিক্স্', 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ এর অন্যতম উদাহরণ হতে পারে। অন্যদিকে বিদ্যাসাগর কর্তৃক ব্যবহৃত রীতি আশ্রয়ী প্রবন্ধসমূহের উদাহরণ হতে পারে, 'একা— কে গায় ওই?' 'মনুষ্য ফল', 'আমার মন', 'বসন্তের কোকিল', 'আমার দুর্গোৎসব', 'একটি গীত', 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব', 'বুড়া বয়সের কথা' ইত্যাদি। এর মধ্যে অবশ্য 'আমার মন', 'বসন্তের কোকিল', কিংবা 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধে কথ্যভঙ্গির সংলাপ আছে। উভয়রীতির মিশ্র রচনা হিসেবে 'ফুলের বিবাহ', 'কাকাতুয়া' কিংবা 'পতঙ্গ' উল্লেখযোগ্য হতে পারে। ভাবুকতার প্রাঞ্জল ও নিরাভরণ বিকাশে 'ফুলের বিবাহ' শ্রেষ্ঠ গদ্য শৈলীর উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ রাখে। ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক বুদ্ধিজীবীর তার্কিক রুচি অনুযায়ী 'কাকাতুয়া' অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ রচনা হিসেবে গণ্য হতে পারে। তাই বলা চলে, বঙ্কিমের গদ্য প্রধানত আবেগ, অনুভব ও যুক্তির মিশ্র প্রকরণে গঠিত গদ্য। তবে, আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রেই তাঁর গদ্যের সমধিক স্ফূর্তি প্রকাশিত। এছাড়া, কমলাকান্তের বিভিন্ন প্রবন্ধে যেমন প্রসন্নের রূপ বর্ণনায় ঘটোঘ্নী (আমার মন), মিন্‌সে (উড়িয়া, অপ্রতুল ব্যবহার, বড় বাজার), মাগী (বুড়া বয়সের কথা, কাকাতুয়া, মার্গ< সংস্কৃত) ইত্যাদি অশিষ্ট শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। বর্তমানে এই সব ধরনের শব্দ অশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এই সব ধরনের শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার অশিষ্টার্থে ছিল না বলেই জানা যায়। স্মর্তব্য বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' (১৮৯২ প্রকাশিত) শীর্ষক গ্রন্থেও 'মাগী' শব্দের উপর্যুপরি ব্যবহার রয়েছে। উল্লিখিত লেখকদ্বয়ের বিশুদ্ধ আবেগ ও আদর প্রকাশার্থে এই শব্দসমূহের প্রয়োগ তৎকালের প্রচল-চেতনা ভিত্তিক।

পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ভাষা-শৈলী বা শিল্প বিষয়ে একটি বক্তব্য উল্লেখ করা সম্ভবত অনুচিৎ হবে না, তাহলো, বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে তাঁর সাহিত্য চর্চার ভাষা বিন্যাস প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭), শিবনাথ শাস্ত্রী

(১৮৪৭-১৯১৯), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪৩-১৯৩২), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮১৯-১৮৮৬) প্রমুখ যথেষ্ট সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমের 'মিশ্র-ভাষারীতি' এই সমালোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। বিশেষত কমলাকান্ত ছাড়া কমলাকান্তের পূর্বে ও সমকালে রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী' ও বিষবৃক্ষ (১৮৭৯) উপন্যাসে ব্যবহৃত এই মিশ্র ভাষারীতি সমালোচক মহলে আলোড়ন তুলেছিল। এই প্রেক্ষিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিতান্ত সুহৃদ হয়েও অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই ভাষাকে 'গরু ঠেঙ্গাইতে লাগিল' ভাষা বলে অভিহিত করেছিলেন। বিশেষত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২)-শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছিলেন "হুতোম পেঁচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রের একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত্তমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসম্মুখে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়।"[১৩] অক্ষয়চন্দ্র বা ন্যায়রত্নের থেকে আরো নির্মম সমালোচনা করেছিলেন 'সোম প্রকাশের' সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'সোম প্রকাশে' বঙ্কিমের ভাষাকে এবং এই ভাষা বৈশিষ্ট্য অনুসারীদের 'শব পোড়া ও মড়া দাহের দল' হিসেবে সমালোচনা করেছিলেন। উল্লিখিত সমালোচকবৃন্দ বঙ্কিমের ভাষার 'গুরু-চণ্ডালী দোষ' সহ্য করতে পারেননি বলেই এই ধরনের সমালোচনার উদ্ভব। তবে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় লেখক বঙ্কিমের ভাষাকে "নতুন এক বাঙ্গালা গদ্য" হিসেবে 'বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী, অপরদিকে আলালী (এই অভিধা প্রথম ব্যবহার করেন রামগতি ন্যায়রত্ন) ভাষার মধ্যগা' হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের ভাষা বৈশিষ্ট্য আলোচনায় বলেছেন, 'বঙ্কিমের লেখনীতেই বাংলা ভাষার সঙ্গে নব যৌবন প্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন হল।' অতএব, এ যাবৎকাল পর্যন্ত বঙ্কিমের ভাষা নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা প্রভৃতি হয়েছে, তার মধ্যে সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্যই সম্পন্ন ও পরিণত। যদিও সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের ভাষা বিষয়ক আলোচনায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পক্ষাবলম্বন করে বঙ্কিমের বিরুদ্ধেই ছিলেন।'[১৪]

লক্ষ করলে দেখা যাবে, 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের কেন্দ্রীয় চরিত্র কমলাকান্তসহ অন্যান্য অপ্রধান চরিত্রের বক্তব্যে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধের বর্ণনাংশে 'মনুষ্য চরিত্রের' বিভিন্ন অপ-উপাদান, যেমন অর্থলিপ্সা, মোসাহেবী, ভাঁড়ামি, বিশ্বাসঘাতকতা,

আত্মম্ভরিতা, চৌর্যবৃত্তি, মূর্খতা, মিথ্যা-পাণ্ডিত্য, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি বাঙালী চরিত্রের গুণ (?) অর্থে লেখক প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত গুণপনা সংশ্লিষ্ট মন্তব্য অবশ্য অধিকাংশই হিন্দু সমাজ-কেন্দ্রিক, কয়েকটি ইংরেজ শাসক-শোষকের প্রতি এবং একটি মাত্র স্থানে রয়েছে মুসলমান 'কসাই' এর উল্লেখ। সেখানে অবশ্য (বড় বাজার) কমলাকান্তের নিজেকে গরু হিসেবে ভাবনার প্রসঙ্গ প্রধান্য লাভ করেছে। মুসলমান কসাই নয়। তবে এই প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের যৌক্তিকতা হচ্ছে, প্রধানত: হিন্দু বাঙালী চরিত্রের প্রতি এই প্রযুক্ত বিশেষণ বা গুণ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বসৃষ্ট কিনা? কিংবা বিষয়টি সৃষ্টির পিছনে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান, যা কি না বঙ্কিম কর্তৃক গৃহীত হয়েছে; তাই এ প্রসঙ্গে ঈষৎ আলোকপাতের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা প্রয়োজন, দীর্ঘ মধ্যযুগের শুরু থেকেই বিদেশী-বিভাষী শাসকদের কাছে বাঙালী জাতি বিজিত হিসেবে পরিগণিত। সুলতানী ও মুগল শাসনামলেও মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাঙালী ছাড়া অধিকাংশ বাঙালীই ছিল নির্যাতিত, নিপীড়িত এবং শোষিত তো বটেই। 'জান্নাতুল ফিলাদ' (পৃথিবীর ভূ স্বর্গ), 'সোনার বাংলা' ইত্যাদি যে নামেই এদেশকে অভিহিত করা হোক না কেন, দীর্ঘ ঐতিহাসিক কাল থেকে এদেশের সাধারণ মানুষ ছিল শোষিত-বঞ্চিত, নিরক্ষর এবং অসংগঠিত। 'তুর্ক ও মুগল যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের' কাছে এদেশে ছিল শোষণের স্বর্গভূমি। ফলে দীর্ঘ শোষণে অধিকাংশ বাঙালীর চিন্তা-চেতনা আত্মকেন্দ্রিকতায় ঋদ্ধ হতে সময় লাগেনি। নবাবী শাসনের প্রারম্ভ থেকে উল্লিখিত অবস্থার ধারা কিছুটা পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই পরিবর্তনের রূপ হলো, প্রধানত হিন্দু সমাজমুখী। যেমন: নবাবী শাসনামলের প্রারম্ভে ব্রাহ্মণদের প্রতি মুর্শিদকুলী খাঁর ব্যক্তিগত আনুকুল্য প্রদর্শনের সংবাদ পাওয়া যায়। আরো জানা যায়, আঠারো শতকে বাংলায় মুসলমান জমিদারের সংখ্যা বেশি ছিল না। আবার এই সংখ্যার দশ ভাগের নয় ভাগই ছিল হিন্দু। স্থানীয় সদর দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থাতেও নিযুক্ত ছিল হিন্দু কর্মচারী। অত:পর, এদেশে ব্রিটিশ জন কোম্পানীর ক্ষমতা দখলের সময়ও (১৭৫৭) বাংলার সমস্ত কানুনগো ছিল হিন্দু। শুধু নিম্নশ্রেণীর রায়তদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান। সত্য যে, মুর্শিদকুলী থেকে আলীবর্দী পর্যন্ত প্রত্যেকেই কমবেশি কঠোর শাসক ছিলেন এবং শাসনকাজে সুবিধা আদায়ের জন্য হিন্দু কর্মচারী নিয়োগে ইতঃস্তত করেননি। কিন্তু কর্মচারীসহ সাধারণ বাঙালীদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক যে নৈর্ব্যক্তিক কিংবা আদতেই প্রভু-ভৃত্যতুল্য ছিল, তা অস্বীকারের উপায় নেই। অর্থাৎ পরস্পর বিশ্বাস বা আত্মিক সম্পর্ক তৈরির বিষয়টি তখনও সমাজ গড়েনি বা গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। এই ধরনের এক স্থিতিস্থাপকতাশূন্য পরিস্থিতিতে বাংলার শাসন ক্ষমতার উৎসের পরিবর্তন ঘটে। যদিও এদেশে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা স্থাপন ও দৃঢ়করণে

সকল বর্ণ ও শ্রেণীর হিন্দুদের সাহায্য সহযোগিতা বেশি ছিল, তথাপি এদেশের জনগণের প্রতি তাদের একদেশদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি (নবাবী শাসকদের মতোই) কার্যকর ছিল। কেননা, ব্যক্তি চরিত্রের অভিজ্ঞতায় বৃটিশরা ছিল মুগল-নবাবদের থেকে অধিকতর অভিজ্ঞ। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। যেমন, চা-আমদানীর উপর বৃটিশ কর্তৃক কর আরোপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে (১৭৭৬) ইংরেজরা তাদের প্রজারূপী মার্কিনীদের কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু এদেশে তারা বিজয়ী হয়েছিল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। যে লর্ড কর্নওয়ালিশ যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে বৃটেনের দুর্ধর্ষ লালাকোর্তা বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে পরাজিত হয়ে জর্জ ওয়াশিংটনের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তিনিই এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। তারপূর্বে যে সিরাজদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে (১৭৫৭) পরাজিত করা হয় তাও ঐতিহাসিক সত্য। অর্থাৎ ভারতীয় উচ্চবিত্তের কোন কোন অংশ যে লোভী ছিল, বিশ্বাসঘাতক ছিল, ইংরেজদের কাছে সে সত্য উন্মোচিত হতে সময় লাগেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই, জন শোর (১৭৯৩: মুগল রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ইংরেজদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ কর্মকর্তা), স্যার পিটার গ্রান্ট (১৭৯৭) লর্ড ওয়েলেসলী (১৮০১), লর্ড বেবিংটন মেকলে (১৮৩৫), প্রমুখ অধিকাংশ ইংরেজ শাসক সাধারণ হিন্দু-বাঙালীদের 'ভালো' বা 'ভদ্রলোক' (মুগল শাসনামল থেকে 'ভদ্র' বলতে উচ্চ বর্ণের হিন্দুকে বোঝানো হতো বলে অনেকে মনে করেন) হিসেবে দেখেননি, বিচার করেননি। উল্লিখিত ইংরেজ শাসকবর্গের লেখায়, প্রশাসনিক মন্তব্যে বাঙালীদের বিষয়ে মন্তব্য ছিল, 'নেটিভ', 'লোভী', 'মিথ্যাচারী', 'কপট', 'মূর্খ', 'স্বদেশ-প্রেমহীন', 'বর্বর', 'নৈতিকতাহীন', 'চরিত্রহীন', 'অধঃপতিত' ইত্যাদি জাতি। আরো সত্য যে, তৎকালের ইংরেজ শাসক ব্যতীত অনেক বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবীও স্বজাতি সম্পর্কে ইংরেজদের মতো উপর্যুক্ত ধারণা পোষণ করতো। এই ধরনের বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় প্রধান। বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে রাজা রামমোহনের মতামতের সঙ্গে স্যার পিটার গ্রান্টের মতামতের খুব বেশি পার্থক্য ছিল না। রামমোহন ব্যতীত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডা: দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯-৭০), বিখ্যাত দেশনেতা ও বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের পিতা) নামও এই ধারায় উল্লেখযোগ্য।[১৫] এই তাৎপর্যে চাকুরি ও সাহিত্যচর্চার সূত্রে ইংরেজ শাসক ও শীর্ষস্থানীয় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা বিশ্লেষিত বাঙালী চরিত্রের অপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত থাকার সম্ভাবনা অধিক। অধিকন্তু, তাঁর চাকুরি জীবনে ১৮৭৪ সালে কর্নেল ডফিন এবং ১৮৮১ সালে 'অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি' হিসেবে কর্মরত অবস্থায় কলম্যান প্যাট্রিক লুইস মেকলের কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছিলেন,

তাও বাঙালীদের প্রতি ইংরেজ শাসকের পূর্ব বর্ণিত বর্ণবিদ্বেষমূলক ভৃত্যতুল্য ব্যবহারেরই অন্যতম প্রকাশ। তাছাড়া, চাকুরি জীবনে অনেক ইংরেজ ছাড়াও তিনি অনেক 'স্বদেশী-স্বজাতি'র পদস্থ ব্যক্তিদের কাছে থেকেও লাভ করেছিলেন 'উপেক্ষা' ও 'বক্রদৃষ্টি'। এই সব ঘটনার অধিকাংশই ঘটেছিল 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ ও কমলাকান্ত রচনার প্রাক্কালে। এই পর্যাবৃত্তে, আরো পরবর্তীকালে বাঙালী জাতির চারিত্রিক আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্থূলতা লক্ষ করে তিনি বলতে দ্বিধা করেননি, "এ ঈর্ষাপরবশ আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই।" পাশাপাশি ইংরেজ শাসকদের প্রতিও ক্ষুব্ধতা হেতু কোন এক মুহূর্তে বলতে দ্বিধা করেননি, "চাকুরি আমার জীবনের অভিশাপ।"[৪]

আত্মস্বাতন্ত্র্যে দৃঢ়মূল বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যথিত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাঙালী চরিত্রের অপ-ধারণা যুক্ত হতে স্বাভাবিক কারণেই সময় লাগেনি। মূলত, তৎকালের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ প্রতিধ্বনিমূলক চরিত্রের বুদ্ধিজীবীর শ্রেণী ও বর্ণ প্রভাবিত বিভিন্ন সীমাবদ্ধ আন্দোলন, রাজনৈতিক সুবিধা গ্রহণ, অর্থ লোভের প্রকাশ ইত্যাদির সঙ্গে দেশের বৃহত্তর জনগণের চাওয়া-পাওয়া, তাদের সমস্যা নিরসনের লক্ষে কোন সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য সমন্বয় ছিল না। ফলে মুগল শাসনের সমাপ্তি উত্তর ইংরেজ শাসকদের মনে কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙালী চরিত্র সম্পর্কিত হীনমন্য ধারণা বিস্তারের সুযোগ পায়, এবং যুগ পরিবেশের প্রভাবে যা স্বাভাবিক ভাবেই কোন কোন বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে প্রভাবিত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত দেশকালের প্রভাবে আরো পল্লবিত হয়ে ওঠে, এবং 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত', 'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত'সহ বিভিন্ন লেখায় তা বিচিত্র আঙ্গিকে স্থান করে নেয়। বলা বাহুল্য নয় যে, 'কমলাকান্তে' বাঙালীর গুণপনার মন্তব্যসকল প্রধানত: শিল্প শোভন বাক্যিক ইঙ্গিতময়তায় প্রকাশিত এবং কমলাকান্তের পরবর্তী গ্রন্থ 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে' (১৮৮০) এই চিত্রণ আরো গাঢ় রঙ্গে উজ্জ্বল ও ব্যঞ্জনাময়। কিন্তু 'কমলাকান্তে' যা পরোক্ষ, মুচিরামে তা প্রত্যক্ষ, নির্মম নির্বিচার। সেখানে কাব্যিক ইঙ্গিত অপেক্ষা ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে উপন্যাস বা উপাখ্যানের আকারে শ্লেষ মণ্ডিত বর্ণনা গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছে। তবে, এবিষয় সমাপ্ত করার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে, বাঙালীর কোন কোন শ্রেণী ও বর্ণের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট মনোভাব আমৃত্যু বজায় ছিল না। বিশেষত 'বিবিধ প্রবন্ধে' অন্তর্ভুক্ত 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি-ইতিহাস' ইত্যাদি বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক কয়েকটি প্রবন্ধে মুগল ও ব্রিটিশ শাসকরা যে এদেশে তাদের শোষণ-শাসনের সুবিধার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে বাঙালীদের চরিত্রের প্রতি নির্বিচারে মিথ্যা-বিশেষণ আরোপ করেছিল, তা লেখক প্রমাণে যত্নবান হয়েছেন। উল্লিখিত পটভূমিতে, এ

বক্তব্য উপস্থাপন সঙ্গত হতে পারে যে, ১৮৫৭ সালে অনুষ্ঠিত 'সিপাহী বিদ্রোহের' সময় বাঙালী হিন্দু (এবং মুসলমানও) বুদ্ধিজীবীবৃন্দ[১৬] ব্রিটিশ শাসনের প্রতি যেভাবে অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশ করেছিল, পরবর্তীকালে তা অপসারণের ক্ষেত্রে এবং বাঙালী জাতির স্বতন্ত্র ইতিহাস চেতনা ও দেশপ্রেম বিকাশে 'ব্রিটিশ শাসনের দ্বিতীয় পর্বের বুদ্ধিজীবী হিসেবে' বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান স্মরণীয়। এই প্রেক্ষিতেই তিনি ঝান্সীর রাণীকে নিয়ে গ্রন্থ লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনের ইতিহাস চর্চায় 'প্রাচীন গৌরবের কথা' বড় হয়ে উঠেছিল বলেই বঙ্কিমের আদর্শ অবশেষে ঝান্সীর রাণী নয়, শ্রীকৃষ্ণ অভিমুখী হয়ে পড়ে। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ সংস্কারের চেয়ে 'নৈতিক' বিশুদ্ধতা এবং 'রাজনৈতিক পুনর্জীবন' লাভকে বড়ো বলে মনে করেছিলেন। প্রাচীনের গৌরব কথা সেদিনের ইতিহাস চর্চায় প্রাধান্য পেয়েছিল।[১৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সময়ের এই দেশের মানুষের স্বদেশ প্রেমের বিষয়ে লিখতে গিয়ে 'জীবন স্মৃতির' একস্থানে উল্লেখ করেছেন, "বস্তুত সে সময়টা স্বদেশ প্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোক দেশের ভাষা ও দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।"[৩] বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৮-১৯০৫) সমবয়সী না হলেও সমকালের। এহেতু, ব্রিটিশ শাসনের এক দুর্মর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকাল অতিবাহিত। তাঁর জন্মের অব্যবহিত পূর্বেই ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি রাজভাষা (১৮৩৫) হিসেবে গৃহীত। বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজি ভাষাতেই উচ্চ শিক্ষিত হয়ে তখনকার দিনের বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থিত চাকুরি 'ডেপুটি' হিসেবে কর্মজীবন শুরু ও নিষ্পন্ন করেন। কিন্তু নৈতিক শুদ্ধতায় আস্থাশীল ছিলেন বলেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের মতো আইনের মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। অন্যদিকে, ইংরেজ শাসনের (এবং ইংরেজি ভাষাও, দ্র: বঙ্গদেশের কৃষক) প্রতিও তাঁর যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল, তার পরিচয়ও অল্প। তিনি নিজে ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ-পদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন বলেই ইংরেজ শাসকদের শাসন-শোষণ, শ্রেণীভেদের প্রবঞ্চনা তাঁর অনুভব করতে দেরি হয়নি। এর পরিচয় কমলাকান্তের বিভিন্ন প্রবন্ধসহ এই গ্রন্থের পূর্বাপরে রচিত যথাক্রমে 'লোক রহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিতে' স্পষ্ট। 'লোক রহস্যের' অনেক রচনার মধ্যে অন্যতম প্রধান রচনা 'হনুমদ্বাবুসংবাদে' তিনি এপ্রসঙ্গে সরাসরি বলেছেন, "The proof of the pudding is in the eating thereof— কথাটা কি, তুমি রামের দাস—আমি ইংরেজের দাস।" অতঃপর 'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিতে'ও যে কথা তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি, তাহলো —"Glorious British Constitution!"— এই গ্লোরিয়াসের ব্যাখ্যা সচেতন পাঠকের কাছে করা নিস্প্রয়োজন। এই দুই বিশিষ্ট গ্রন্থের মধ্যবর্তী গ্রন্থ 'কমলাকান্ত'। সেখানে প্রথমেই লেখক কমলাকান্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে জনৈক

ইংরেজ সাহেবের আপিসে কমলাকান্তের এক 'পে-বিল' প্রস্তুতের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। সেই 'যথার্থ পে-বিল' প্রস্তুতের বর্ণনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপনিবেশিক শাসন-সংকট উদ্ভূত মানসিকতার পরিচয় বিধৃত। একদিকে ইংরেজের অধীনে চাকুরি, অন্যদিকে চিন্তা-চেতনায় বিশুদ্ধ বাঙালীত্ববোধ আশ্রয়ী নৈতিক স্বাতন্ত্র্যের আবাহন, 'মনের ভিতর মন লুকানো (দ্র. একা-কে গায় ওই?) সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈরথ মনোধারার সংকটজাত যন্ত্রণার প্রকাশ এই শিল্প-সৃষ্টিতে উহ্য থাকেনি। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকে সিপাহী বিদ্রোহের পরে শহুরে মধ্যবিত্ত ছিল প্রধান ইউরোপীয় রেনেসাঁ, ফরাসি-বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭৭৬) সম্পর্কে জ্ঞাত। ফলে, এই মধ্যবিত্ত সমাজ 'ঈশ্বর প্রদত্ত আর্শীবাদ হিসেবে' ভারতে ইংরেজ শাসনের চারিত্র-লক্ষণ নির্ণয়ে অতীতের মতো প্রায় নির্বিকল্প ইতিবাচক আবেগে বিশ্বাসী ছিল না। এই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র পীড়িত হয়েছেন; তাই এই সংকটের কারণেই 'কমলাকান্তের' 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে বলেছেন "স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্তে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল।" অর্থাৎ বাস্তবতা অপেক্ষা 'আকাশ-কুসুম' চর্চায় বাঙালীর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে এবং এই প্রতীতীর কারণেই অবশেষে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'অনুকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনায় ইঙ্গিত অপেক্ষা স্পষ্টভাবেই বলেছেন "উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা গিয়াছে।" 'কমলাকান্তের 'মনুষ্য ফলে' যা ছিল শ্রেণী বর্ণ ও পেশাজীবী চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ, 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' উত্তর অনুকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে তা হয়েছে আধুনিক বাঙালীর সার্বিক চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতিভূ। ঔপনিবেশিক শাসন-সংকটে চূর্ণ বাঙালী সত্তার পরিবর্তিত বিচিত্র রূপই এইভাবে বঙ্কিমের লেখায় মূর্ত হয়েছে। উনিশ শতকে ইংরেজ শাসন-শোষণ সম্পৃক্ত শহুরে ভদ্রলোকদের বিচ্ছিন্নতাকেন্দ্রিক জীবনবোধের উদ্বৃত্ত ফসল হিসেবে সৃষ্ট এক অনিবার্য নৈঃসঙ্গবোধে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাড়িত হয়েছেন, ফলে তারই প্রভাবে বঙ্কিম সৃষ্ট কমলাকান্তে প্রতিনিয়ত এক দুর্বার নৈঃসঙ্গবোধ প্রভাবিত হয়েছে, বিবশ-অনন্যমনা হয়েছে। অথচ সত্য যে, পূর্বে উদ্ধৃত 'অনুকরণ' প্রবন্ধানুসারে বঙ্কিমচন্দ্র বাহ্যত 'এই অদ্ভুত বাঙালীদেরই' অন্যতম ছিলেন। গোত্রভুক্ত হয়েও গোত্র-চরিত্র ব্যবচ্ছেদের এই অসাধারণ সাহস ও মনীষা তাঁর দৃঢ় মনন শক্তিরই প্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে নিছক বস্তু সঞ্জাত ইংরেজ শাসনের প্রবঞ্চনা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিজিত বাঙালীর সমূহ বেদনা-দুর্বলতা ও অনিকেত মনোভাব যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তারই স্ফটিক স্বচ্ছ শৈল্পিক প্রতিবিম্ব 'কমলাকান্ত'।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১. বঙ্কিম রচনাবলী, ১৩৮৭/২য় খণ্ড; যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত সাহিত্য প্রসঙ্গ, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, মাঘ ৭ম মুদ্রণ। এখানে 'বঙ্গদর্শনের' প্রকাশ সাল ভুল দেওয়া হয়েছে। পৃ. এগার। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক রচিত সব প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত। 'সন্দর্ভ' অভিধা বাগল কর্তৃক ব্যবহৃত। পৃ. সতর। বঙ্কিম-জীবনীতে বলা হয়েছে ১৮৭৬, দ্র. ১৫৯ পৃ. [সহ দ্রষ্টব্য : গোপাল চন্দ্র রায়, সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ১০ এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বঙ্কিম জীবনী, পৃ. ১৫৭-১৫৯]

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬১; বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮।

অরবিন্দ পোদ্দার, ১৯৯৪; বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপনী, কলিকাতা ৭ মুদ্রণ আগস্ট; পৃ. ৬১।

ক্ষেত্রগুপ্ত, ১৯৯০; বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবতা এবং, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, পৃ. ১১০ ও অন্যান্য।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১৯৯৩; বাংলা সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা জানুয়ারি, পৃ. ৮৪-১১১। লী হান্টের 'দি ক্যাট বাই দি ফায়ার' শীর্ষক প্রবন্ধের সঙ্গে 'বিড়াল' প্রবন্ধের সাযুজ্য সম্পর্কে দ্র. পৃ. ১০৮।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংকলন; দ্র. কৌতুকহাস্য, পৃ. ১৫১, ২৩৮। চারিত্র পূজা; পৃ. ৬৬।

৩ক. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১৯৮৬ ৩য় পর্ব; হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, ফার্মা কেএলমএম প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ২য় প্রকাশ, ১৯০-১৯১।

৪. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৩৯৫; বঙ্কিম-জীবনী, অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায় সম্পাদিত; পুস্তক বিপণী সংস্করণ, কলিকাতা, ৪র্থ সংস্করণ আষাঢ়, পৃ. ১৯২-১৯৩, ৪১৭-১৮, [সহ দ্রষ্টব্য: শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পূর্বোক্ত]। পৃ. ১৪৩।

৫. নিখিল নাথ রায়, ১৯৮৮; ঐতিহাসিক চিত্র মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লি: সংস্করণ, কলিকাতা। সুনীল সেন কর্তৃক লিখিত ভূমিকার শেষাংশ, এবং সাধারণ পৃ. ২৬৫-৩০৯ ও অন্যান্য।

বিপিনবিহারী গুপ্ত, ১৯৮৯; পুরাতন প্রসঙ্গ, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পুস্তক বিপণী সংস্করণ, কলিকাতা, আগস্ট; পৃ. ২৫৮ ও অন্যান্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

৬. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ১৯৮২; [সম্পাদিত] বঙ্কিম প্রসঙ্গ, নবপত্র প্রকাশন সংস্করণ, কলিকাতা, মার্চ; পৃ. ৩৩-৩৯। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'এসোঁ এসোঁ বঁধূ, দ্রষ্টব্য। 'সাম্য' সম্পর্কিত উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য পৃ. ১২০-১২২।

৭. সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৮; রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুর্বণরেখা, কলিকাতা ১ম প্রকাশ, এপ্রিল; পৃ. ১১৩-১১৪।

৮. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮/১ম খণ্ড; বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভূমিকা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি:, কলিকাতা ডিসেম্বর, পৃ. ৯৫, ২৯; [উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থে স্যাটায়ার উইট হিউমার যথাক্রমে বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ ও কৌতুক হাস্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ড: অজিতকুমার ঘোষ রচিত বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় (করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৯ সংস্করণ) স্যাটায়ার উইট ও হিউমারকে যথাক্রমে ব্যঙ্গরস, বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস ও করুণ হাস্যরস বলা হয়েছে। দ্র: পৃ: ৩৫-৪৬।]

৯. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭২; মনীষী স্মরণে, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা মার্চ, প্রবন্ধ: বঙ্কিমচন্দ্র পৃ. ২২।

১০. ক্ষেত্র গুপ্ত, ১৯৮৯; [সম্পাদিত] বঙ্কিমচন্দ্র: আধুনিক মন, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা ১ম প্রকাশ নভেম্বর, পৃ. ১৮৭-২০৩; দ্রষ্টব্য প্রবন্ধ: বারিদবরণ চক্রবর্তী রচিত সাম্য: বঙ্কিম বীক্ষণ, পৃ. ৬৪-৬৮-৭৫; এ প্রসঙ্গে আরো দ্রষ্টব্য: সাপ্তাহিক দেশ, ফরাসী বিপ্লব দ্বিশত বার্ষিকী সংখ্যা, ১৫ই জুলাই ১৯৮৯, পৃ. ৫৭-৫৮; অমলেশ ত্রিপাঠীর ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, [প্রবন্ধ: ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা] পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২য় সংস্করণ জুন ১৯৮৮. [কলিকাতা] পৃ. ৪৯-৭৮।

১১. আহমদ শরীফ, ১৩৮২; বঙ্কিম-বীক্ষা : অন্য নিরিখে, ভাষা সাহিত্য পত্র, ৩য় কার্তিক; বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৭।

১২. নবেন্দু সেন, ১৯৯০; বাংলা গদ্য, স্টাইলিস্‌টিকস্‌, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা, ২য় মুদ্রণ মার্চ; পৃ. ১০০-১১২ ও অন্যান্য।

১৩. রামগতি ন্যায়রত্ন, ১৯৯১; বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সুপ্রীম বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স কলিকাতা নতুন সংস্করণ, পৃ. ২৫৮। অবশ্য রামগতি ন্যায়রত্নের এই মন্তব্য তৎকালে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়। তিনি নিজেই উল্লিখিত মন্তব্যকে বলেছিলেন 'অতীব কৌতুকজনক'। দ্র. বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, গ্রন্থন সংস্করণ, কলিকাতা জুলাই ১৯৭৩; পৃ. ১৯-২০ ও অন্যান্য। এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য

যে, বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বোক্ত রামগতি ন্যায়রত্নের সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন 'বাঙ্গালা ভাষা' [বঙ্গদর্শন ১২৮৫, জ্যৈষ্ঠ; রচনাবলী পৃ. ৩৬৮-৩৭৪] শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে। এই প্রবন্ধে ন্যায়রত্নের সমালোচনাকে 'নিতান্ত কুরুচির ফল' হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন (দ্র. পৃ. ৩৭০-৭১)।

১৪. শিবনাথ শাস্ত্রী ১৯৮৩; রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বিশ্ববাণী প্রাইভেট লি: সংস্করণ অক্টোবর; পৃ. ২০৯। বিশেষ সহ দ্রষ্টব্য: বঙ্কিম প্রসঙ্গ: পৃ: ২।

১৫. অভী দাস ১৯৮৬; বাঙালী চরিত্র: দুই শতাব্দী পূর্বে, সাপ্তাহিক দেশ, কলিকাতা ৮ই ফেব্রুয়ারি, পৃ. ৩৮-৪৮।

রাজনারায়ণ বসু ১৩৬৩; হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যাদিসহ সম্পাদিত দেবীপদ ভট্টাচার্য, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লি: কলিকাতা পৌষ; পৃ. ১০।

লর্ড মেকলে ও লর্ড কার্জন সম্পর্কে দ্র. মৌলবী শেখ আবদুল জব্বার, ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র, গফফরগাঁও, ময়মনসিংহ ২য় সংস্করণ, চৈত্র ১৩২০; পৃ. ৫২-৫৩; প্রবন্ধ আধুনিক শিক্ষা। Syed Nurullah & J.P. Naik, History of Education in India, (During British Period), Macmillan, London 1943, বিশদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, ১৯৬৭; বাংলার অর্থনৈতিক জীবন, এ মুখার্জ্জী অ্যান্ড কোং, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ; পৃ. ১২, ২৪, ১২৭-১২৮। Economic History of Bengal, Vol. 1, Calcutta 1965, P-4 Introduction.

১৬. দেবেশ মুখোপাধ্যায় ১৩৮৬; সিপাহী বিদ্রোহের কলকাতা, সাপ্তাহিক অমৃত, ১লা কার্তিক, কলিকাতা, পৃ. ১৩;

১৭. দেবীপদ ভট্টাচার্য, ১৯৬৪; বাংলা চরিত সাহিত্য (১৮০১-১৯৪১), সুপ্রকাশ প্রাইভেট লি: কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর; পৃ. ১৭৬-১৭৭।

টীকা : ক. কমলাকান্তের দপ্তর, Confessions of English Opium-Eater: সুকুমার সেন [বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড], ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত [বাংলা সাহিত্যের একদিক], অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনগুপ্ত [Western Influence in Bengali literature] এবং আরো অনেক টমাস ডি কুইনসি রচিত কনফেসন্‌স অব অ্যান ইংলিশ অপিয়াম ইটার (১৮২১) শীর্ষক গ্রন্থের সঙ্গে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' বিষয়বস্তু ও রচনাগত সাদৃশ্যের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তবে, সমালোচকরা "কেউই বিশ্লেষণ করে দেখাননি—ডি কুইনসির বইয়ের সঙ্গে কমলাকান্তের দপ্তরের কোথায় মিল বা অমিল। তারও আজ পর্যন্ত প্রকৃত বিচার হয়নি।" এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালের জনৈক

সমালোচকের ভাষায় বলতে হয়, "জীবনদৃষ্টি, কল্পনা প্রসার কোন ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র ডি কুইনসির কাছে ঋণী নন।... প্রিয়রঞ্জন, সুকুমার, শশিভূষণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যাই বলুন না কেন, কমলাকান্তের দপ্তর আর Confessions of an English Opium Eater-এর রচনারীতি এক নয়।

ডি-কুইনসির রচনা Reminiscences ধর্মী, কমলাকান্তের বঙ্কিমরীতি মানবধর্মী।" এ বিষয়ে বিশদ দ্রষ্টব্য: কাননবিহারী গোস্বামী, বঙ্কিমচন্দ্র ও ডি-কুইন্সি, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিক বঙ্কিমচন্দ্র: আধুনিক মন, পুস্তক বিপণী, কলিকাতা ১ম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৮৯; পৃ. ১৮৭-২০৩। এছাড়া ৮ সংখ্যক তথ্যসূত্রে উল্লেখকৃত গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সাহিত্য বিষয়ক ভূমিকায় (বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা) এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্তের মত প্রদত্ত হয়েছে।

টীকা : খ. হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) রচিত কবিতায় দেশপ্রেম বিষয়ে প্রাথমিক দ্রষ্টব্য গ্রন্থ/প্রবন্ধ হলো: রাজনারায়ণ বসু রচিত হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, এমসি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লি: সংস্করণ কলিকাতা পৌষ ১৩৬৩; পৃ. ১৪-১৫। তবে প্রণবরঞ্জন ঘোষ তাঁর উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য', (লেখাপড়া, ১ম প্রকাশ কার্তিক-১৩৭৫) শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, "ডিরোজিওর জীবন ও কাব্যে যে অন্বেষণ বৃত্তি দেখতে পাই, তার মূলে ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই," পৃ. ৪০)। তবে, উল্লিখিত তথ্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মজীবনী' (বিশ্বভারতী, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬২) শীর্ষক গ্রন্থ থেকে (পৃ. ২৬২-২৬৩) থেকে গৃহীত। অবশ্য সম্প্রতি প্রকাশিত সুবীর রায় চৌধুরী রচিত 'হেনরি ডিরোজিও, জীবন ও সময়' (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট দিল্লী: ১৯৯৩) শীর্ষক গ্রন্থে ডিরোজিওর কাব্য প্রসঙ্গ আলোচনা থাকলেও তাঁর কাব্যে দেশপ্রেমের বিষয়ে কোন নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা নেই। রাজা রামমোহন রায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেম বিষয়ে যথাক্রমে দেখা যেতে পারে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (৯ম-১১শ অধ্যায়) ও গোলাম মুরশিদ রচিত 'আশার ছলনে ভুলি' (আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: ১ম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৫. পৃ. ২১১-২১২ ও অন্যান্য পৃষ্ঠা। 'হিন্দু মেলা' (৩১শে চৈত্র, ১২৭৩) সম্পর্কে দ্রষ্টব্য যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' কলিকাতা. শ্রাবণ ১৩৭৫: দ্র. ভূমিকা ও অন্যান্য পৃষ্ঠা। 'হিন্দু মেলার' সপ্তম অধিবেশনে (১৮৭৩) মনোমোহন বসু যে ভাষণে 'প্রথম স্বাধীনতার' দাবী উত্থাপন করেছিলেন. গ্রন্থকর্তা তাকে বলেছেন, 'ভারতের স্বাধীনতার প্রথম দাবী'। কিন্তু কিন্তু মনোমোহন বসু কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট ভাষণে ভারত শব্দটি উল্লেখ অপেক্ষা 'বাঙ্গালাদেশের' উল্লেখ দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট ভাষণটির

উল্লেখযোগ্য অংশ যোগেশচন্দ্র বাগল, রচিত 'জাতীয়তার নবমন্ত্র' কলিকাতা, প্রকাশ সাল নেই (তবে নিবেদনপত্রে প্রদত্ত তারিখ ১লা আশ্বিন ১৩৫২) শীর্ষক গ্রন্থের ৫৯-৬০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। উক্ত ভাষণে বলা হয়, "বাঙ্গালাদেশে দৈহিক উৎকর্ষের এইরূপ উৎসাহ দেখিয়া মনে এইরূপ একটি ভাবের উদয় হইতেছে যেন জ্ঞান নামক পুরুষ ..."স্বাধীনতা" নাম্নী সুরমনোমোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন। লক্ষনীয়, এখানে 'ভারত' কথাটির উল্লেখ নেই। তবে, যোগেশচন্দ্র বাগলের 'হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসবিদ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "স্বজাতীয়দিগের মধ্যে স্বভাব স্থাপন করা" ও "স্বদেশের উন্নতি বিধান করাই" এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। তবে এই মেলার দ্বিতীয় বছরের অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯) তাঁর ভাষণে স্বদেশ অর্থে ভারতভূমিকে উল্লেখ করেছিলেন বলে জানা যায়। স্মর্তব্য তিনি এই মেলার সম্পাদক ছিলেন। তাই গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিধাকে স্বীকার করে নিলে স্বদেশ অর্থে 'ভারত' বাগলকৃত এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু, এটি দুর্বল যুক্তির আলোকে দূর কল্পনা বটে। কেননা মূল ভাষণদানকারী মনোমোহন বসু নিজেই 'বাংলাদেশ' কথাটির যেখানে উল্লেখ করেছেন, সেখানে 'ভারত' কথাটির প্রয়োজন নেই। উল্লিখিত গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত আরো বলেছেন, "সে যুগের যারা নেতা ছিলেন তাদের অনেকের দৃষ্টি দূর সিন্ধু তীরে নিবদ্ধ ছিল এবং আচরণে ও মানসিকতায় তারা দেশবাসীর প্রতীক ছিলেন না। এদের লক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'কোট পরা কায় সঁপেছেন হায়, শুধু স্বদেশের জন্য" (পৃ. ৭-৯)। সেকালের এই অবস্থা থেকে বাঙালী হিন্দু জাতিকে উদ্ধারের জন্য হিন্দুমেলার অবদান অনস্বীকার্য। তবে হিন্দুমেলার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা জানা যায় না। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি: (১ম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯১-শীর্ষক গ্রন্থেও এ বিষয়ে প্রমাণিত কোন তথ্য প্রদত্ত হয়নি। তবে, কলকাতার সন্নিকটে সিঁথীর মোড়ে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'মরকত নিকুঞ্জে' অনুষ্ঠিত হিন্দু কলেজ রি-ইউনিয়নের দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বঙ্কিমের গাঢ় সম্পর্কের কথা জানা যায়। 'রাজনারায়ণ বসুর হিন্দু বা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন স্মৃতিতে ও 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে দীর্ঘ উল্লেখ আছে।'

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দেশপ্রেম ও অন্যান্য বিষয়ে জানার জন্য দ্রষ্টব্য: রামগোপাল সান্যাল রচিত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, অনিলকুমার সেনগুপ্ত সম্পাদিত, রমা প্রকাশনী সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৯৪; নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক হরিশচন্দ্র সম্পর্কিত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থের ৭৪-৭৫ পৃ. থেকে গৃহীত।